আদর্শ নেতা

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আবদুস শহীদ নাসিম

আদর্শ নেতা
মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আবদুস শহীদ নাসিম

আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 978-984-645-079-2
শপ্র. ১৮

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল
নতুন সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

কম্পোজ
Saamra Computer

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৮০.০০ টাকা মাত্র

ADARSHO NETA MUHAMMAD RASULULLAH (PBUH) By Abdus Shaheed Naseem. Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Ràilgate, Dhaka-1217. Phone : 8311292. Mob.- 01753422296, New Edition : February 2011.

Price Tk. 80.00 only.

গ্রন্থকারের কথা

ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বার্তাবাহক ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম। আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী ও প্রবর্তন করে গেছেন। তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে পেশ করেন। এ বিপ্লবী আন্দোলনের তিনিই ছিলেন নেতা। তিনি এ আন্দোলনকে বিজয়ী করেন এবং মানব রচিত মতবাদ সমূহকে পরাজিত ও পরাভূত করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য তিনি মানুষের মধ্যে চিন্তার বিপ্লব ঘটান, চরিত্রের বিপ্লব ঘটান এবং এরি ধারাবাহিকতায় সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত করেন। এই পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব প্রক্রিয়ায় তিনি যে সুদক্ষ ও সুনিপুণ নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তা-ই সর্বকালের ইসলামি আন্দোলন ও নেতৃত্বের আদর্শ। এই বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি যে কর্মনীতি ও কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা-ই সর্বকালের ইসলামি আন্দোলনের কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের মডেল।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. স্বঘোষিত নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল, আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত নেতা। কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা তাঁর তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো :

১. তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আল্লাহ আর কোনো নবী-রসূল নিযুক্ত করবেন না।

২. তিনি কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর রসূল।

৩. তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর জন্যে এক বিশেষ অনুকম্পা, রাহ্মাতুল লিল্ আলামীন।

সে জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে নিখুঁতভাবে আদর্শ মানুষ ও আদর্শ নেতা হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত পূর্ণাঙ্গ মানব বা ইন্‌সানে কামিল (Perfect Man)।

ব্যক্তিত্বে, নেতৃত্বে, নৈতিকতায়; জ্ঞানে, গুণে, প্রজ্ঞায়; দয়ায়, দক্ষতায়; সাহসে, শাসনে; সুন্দরে, সৌন্দর্যে; পূণ্যে, পবিত্রতায়; দানে, দরদে; দারিদ্রে, ধৈর্যে; সততায় বিশ্বস্তায় সর্বোপরি সর্বগুনে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নেতা।

এ গ্রন্থে আমরা তাঁর জীবনাদর্শের কিছু কিছু দিকের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

এর আগে আমরা 'বাংলাদেশে রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার' শীর্ষক একটি পুস্তক লিখেছিলাম। সেটিকে সমৃদ্ধ করেই এখন আমরা পাঠকগণকে 'আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.' গ্রন্থটি উপহার দিলাম।

বাংলাদেশে ইসলামকে সামগ্রিক পর্যায়ে প্রবর্তন ও বিজয়ী করার আন্দোলন ও চেষ্টা-সাধনা চলছে। আজকের এই আধুনিক যুগে বাংলাদেশে যদি সত্যিকার ইসলামি সমাজ প্রবর্তন করতে হয়, তবে অবশ্যি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এর অনুসৃত কর্মনীতি এবং তাঁরই নেতৃত্বের আদর্শকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ পুস্তিকায় তাঁর সমাজ পরিবর্তনের ধারা ও নেতৃত্বের সেই অনুপম নমুনারই একটি ক্ষুদ্র ছবি আঁকা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ করে ইসলামের পক্ষে সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় জনশক্তি বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এর জীবনের এই জীবন্ত ছবি পড়ে প্রাণবন্ত হবার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেই হবে আমাদের শ্রমের সার্থকতা।

আবদুস শহীদ নাসিম
ফেব্রুয়ারি ২০১১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

* * *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

১

সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃত নেতা

মানুষ কর্তৃক মানুষের গুণাবলীর প্রশংসা একটি স্বাভাবিক ও গতানুগতিক স্বীকৃতি। এ প্রক্রিয়া চলছে, চলে আসছে, সবখানে, সর্বত্র। এ স্বীকৃতিরও একটা মর্যাদা আছে। তবে এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মানুষের গুণাবলীর স্বীকৃতি কতো বড় সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কোনো ব্যক্তির আদর্শ, মহতগুণাবলী এবং ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব যখন স্বীকৃতি পায় তার স্রষ্টার আলোকময় অনির্বাণ বাণীতে, তখন তার আকাশ ছোঁয়া অনাবিল পবিত্র মর্যাদার কাছে তো তুচ্ছ হয়ে পড়ে পূর্ণিমার চাঁদ।

একদিকে তিনি ছিলেন মানুষ, সাধারণ একজন মানুষ, সবার মতো সামাজিক মানব। মানুষের মাঝে দিনের সূর্য, রাতের পূর্ণিমা। মানবের মাঝে মানবের সবচে' প্রিয় মানুষ। মানুষের মুক্তিদূত। মানুষের অনুবর্তনের কেন্দ্র।

অপরদিকে তিনি নিখিল বিশ্বপ্রভুর প্রিয় বন্ধু। তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে মানুষ নবী, বার্তা বাহক, নেতা, পথ প্রদর্শক, আশীর্বাদ, করুণার আধার, বরকতের অবারিত দ্বার, সতর্ককারী, সুসংবাদ দাতা ও সমুজ্জ্বল প্রদীপ।

তিনি মুহাম্মদ। তিনি রসূলুল্লাহ। তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম।

নিখিল বিশ্বের প্রভু মহান আল্লাহ তাঁর এই রসূলের, আখেরি রসূলের, মানুষের জন্যে এই মানুষ রসূলের মহত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজ বাণীতে। মানবজাতির প্রতি অবতীর্ণ তাঁর চির শাশ্বত মহাসত্য গ্রন্থ আল কুরআনে তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। মানব সমাজে বিকীর্ণ রসূলুল্লাহর মহত্ত্ব, তাঁর মানবিক ও নৈতিক গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর অনাবিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সর্বগুণে গুণান্বিত তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব, অনুকরণ ও অনুবর্তনযোগ্য তাঁর অনুপম নেতৃত্ব সোনালি অক্ষরে বিনির্ণীত হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে।

বিশ্ব প্রভুর বাণীতে বিচ্ছুরিত তাঁর গুণাবলীর কিছু আলোকরশ্মি বিম্বিত হলো এখানে মুদ্রিত অক্ষরে।

১. তিনি আল্লাহ্‌র নিযুক্ত

মুহাম্মদ সা. স্বঘোষিত নবী বা রসূল ছিলেন না। তিনি স্বঘোষিত নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং পৃথিবীবাসীর স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিযুক্ত রসূল ও নেতা। মহান আল্লাহ মানব সমাজের জন্যে মানুষের মধ্য থেকে যেসব ব্যক্তিদের নবী রসূল ও নেতা নিযুক্ত করেছিলেন, তারা ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য, সৎ, বিশ্বস্ত ও মহোত্তম গুণাবলীর অধিকারী। বিশ্ববাসীর নেতৃত্বের জন্যে আরব থেকে তিনি এমন এক ব্যক্তিকেই তাঁর শেষ রসূল নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মুহাম্মদ। তাঁর নিযুক্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ নিজ বাণীতে ঘোষণা দিয়েছেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ •

অর্থ: মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রসূল গত হয়েছে। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৪৪)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ •

অর্থ: হে মুহাম্মদ! বলে দাও : আমি কোনো নতুন রসূল নই (বিগত রসূলগণের মতোই একজন রসূল)। আমি জানিনা আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে অহি করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (সূরা ৪৬ আহকাফ : আয়াত ৯)

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ • إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ • عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ •

অর্থ: শপথ এই বিজ্ঞানময় কুরআনের! অবশ্য অবশ্যি তুমি রসূলদেরই একজন, সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। (সূরা ৩৬ ইয়াসিন : আয়াত ১-৪)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ •

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) আমরা সত্যসহ তোমার প্রতি এই কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি মানব জাতির জন্যে। (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৪১)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, মুহাম্মদ সা. ছিলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত রসূল। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরল সঠিক ও সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. মানবজাতির জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বশেষ নবী ও নেতা

মুহাম্মদ সা. মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র নিযুক্ত সর্বশেষ নবী ও নেতা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আল কুরআনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا •

অর্থ: মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়; বরং আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত ৪০)

৩. বিশ্বনবী বিশ্ব নেতা

মুহাম্মদ সা. বিশ্বের কোনো বিশেষ ভূ-খন্ড, কিংবা কোনো বিশেষ ভাষা, অথবা বিশেষ কোনো কালের রসূল এবং নেতা ছিলেন না। বরং তিনি ভাষা ও বর্ণের উর্ধ্বে গোটা বিশ্ববাসীর সর্বকালীন রসূল ও নেতা। তাঁর এ নিযুক্তিও স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। দেখুন আল কুরআনের শাশ্বত বাণী :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا •

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। (সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ২৮)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ •

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) বলে দাও : হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যে সেই মহান আল্লাহ্‌র রসূল, যিনি মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর কর্তৃত্বের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো সার্বভৌম কর্তা নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৫৮)

قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ •

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলো : আমার এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ সাক্ষী, আমার প্রতি এই কুরআন অহির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং (ভবিষ্যতে) এটি যাদের কাছে পৌঁছুবে তাদের সতর্ক করতে পারি। (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৯)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ • فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ • إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ •

অর্থ: এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। অতএব কোন্ দিকে যাচ্ছো তোমরা ? এ তো গোটা জগতবাসীর জন্যে উপদেশ। (সূরা তাকভীর : ২৫-২৭)

৪. বিশ্ববাসীর জন্যে আশীর্বাদ

আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আশীর্বাদ :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ •

অর্থ: হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে গোটা জগতবাসীর জন্যে রহমত ও আশীর্বাদ হিসেবে পাঠিয়েছি। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ১০৭)

৫. সর্বোত্তম আদর্শ

জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তিনিই বিশ্ববাসীর জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ •

অর্থ: তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। (সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ২১)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا • وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا •

অর্থ: হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী (witness, model) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে; আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (সূরা ৩৩ আল আহযাব : ৪৫-৪৬)

৬. মহান চরিত্রের অধিকারী

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ • وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) অবশ্যি তোমার জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার, (কারণ) অবশ্যি তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা ৬৮ আল কলম : ৩-৪)

৭. শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থ: তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে এসেছে একজন রসূল, তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার সাগর। (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ১২৮)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ •

অর্থ: আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্তের হতে, তবে তারা তোমার আশ পাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কর্ম সম্পাদনে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতপর কোনো সংকল্প করলে (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে) আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯)

মানুষ মহাসত্যের প্রতি ঈমান না এনে অকল্যাণের পথে ধাবিত হচ্ছে দেখে, তাদের কল্যাণ চিন্তায় তিনি চরম দু:খ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন :

• فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا •

অর্থ: লোকেরা এই মহাসত্য বাণীর উপর ঈমান আনছেনা, সে জন্যে তাদের কল্যাণ চিন্তায় অধীর হয়ে তুমি তাদের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে যেনো নিজের জীবনটাই শেষ করে ফেলবে! (সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ৬)

• وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ •

অর্থ: যেসব মুমিন তোমাকে অনুসরণ অনুবর্তন করে, তাদের প্রতি তোমার (পরম স্নেহের) ডানা মেলে দাও। (সূরা ২৬ আশ শুয়ারা : আয়াত ২১৫)

৮. মানব সম্পদ উন্নয়নের আদর্শ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ •

অর্থ: অবশ্যি আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে; তাদেরকে পরিশুদ্ধ, উন্নত ও বিকশিত করে তোলে এবং তাদেরকে শিক্ষা দান করে আল কিতাব ও হিকমাহ। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪)

* * *

২

ইসলামি নেতৃত্বের আদর্শ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.

১. রসূলুল্লাহ সা.-এর উপর অর্পিত নেতৃত্বের দায়িত্ব

রসূলুল্লাহ সা.-এর নবুয়্যতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন পাকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا • وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا •

অর্থ: হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।' (সূরা আহযাব : আয়াত ৪৫-৪৬)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ •

অর্থ: আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, তিনি স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের আল্লাহর আয়াত শুনান, তাদের তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ) করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ •

অর্থ: তিনি আল্লাহ, যিনি তাঁর রসূলকে আল হুদা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেনো সে (রসূল) এ দীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থাসমূহের উপর বিজয়ী করে। (সূরা তাওবা : আয়াত ৩৩, আসসফ : ৯ আল ফাতাহ : ২৮)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে কী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, এ আয়াত কয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে তা আমাদের বলে দেয়। পয়েন্টওয়ারী সাজালে কথাগুলো দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

১. সাক্ষ্যদান : অর্থাৎ, তিনি তাঁর কথা ও কর্ম দ্বারা ঈমানের অকাট্যতা, আল্লাহর দীনের সত্যতা, বাস্তবতা ও কল্যাণধর্মীতা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন।

২. সুসংবাদ দান : অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে দীন ইসলামকে নিজেদের জীবনে কার্যকর করবে, তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, অনুগ্রহ ও পুরস্কারের সুসংবাদ দেবেন।

৩. সতর্ক করা : অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতার পথে চলবে, তাদেরকে আল্লাহর কঠিন পাকড়াও ও আযাবের ভয় প্রদর্শন করবেন।

৪. মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা : অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহর দীনের সর্বাত্মক ও সর্বাংগীন প্রচার করবেন। মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও আইন মেনে নিয়ে তাঁরই নির্দেশিত পথে চলতে বলবেন।

৫. কিতাব পৌঁছে দেয়া : অর্থাৎ, আল্লাহর কালাম তথা হুকুম, বিধান ও নির্দেশাবলী হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন।

৬. লোকদের তাযকিয়া করা : অর্থাৎ, মানুষের ধ্যান-ধারণা, আকিদা বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে শিরক, নাস্তিকতা, অসৎ কর্মকাণ্ড, কু-প্রথা ইত্যাদি থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দিয়ে তাদের মধ্যে তাওহীদি আকিদা-বিশ্বাস, মহত গুণাবলী, পূত চরিত্র এবং সঠিক রীতি-পদ্ধতির বিকাশ সাধন করবেন।

৭. কিতাব শিক্ষা দেয়া : এর মানে মানুষকে আল্লাহ্র কিতাবের সঠিক উদ্দেশ্য ও দাবি বুঝিয়ে দেবেন এবং তাদের মধ্যে এমন অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সৃষ্টি করে দেবেন, যাতে তারা আল্লাহর কিতাবের মর্মমূলে উপনীত হতে পারে।

৮. হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়া : অর্থাৎ, মানুষকে ঐসব কলাকৌশল শিক্ষা দেবেন যা দ্বারা তারা নিজেদের জীবনের সামগ্রিক বিভাগকে পুরোপুরি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে পারে এবং নিজেদের গোটা জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর দীনকে পূর্ণাংগভাবে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৯. দীনকে বিজয়ী করা : অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে এমনভাবে কায়েম করে দেবেন, যাতে করে মানবজীবনের সমগ্র ব্যবস্থা তার অধীন হয়ে যায় এবং অন্য সকল মত ও পথ তার মুকাবিলায় দমিত ও পরাজিত হয়ে যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেলো, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সা.কে একটি পূর্ণাংগ দীন বা জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা এ দীনের স্বরূপ তুলে ধরা, এ দীনের ব্যাপক ও সর্বাত্মক প্রচার, এ দীনের ভিত্তিতে মানুষের জীবন ও চরিত্র গঠন এবং এ দীনকে পূর্ণাংগরূপে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছেন।

২. রসূলুল্লাহ সা.-এর আন্দোলন ও নেতৃত্ব দান

রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে গড়ে তোলেন এক দুর্জয় আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরু করেন তিনি দাওয়াত, আহ্বান এবং মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব ও পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাঁর এ পরিবর্তন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আসে প্রবল বাধা, চরম অত্যাচার এবং তীব্র যুদ্ধ লড়াই। সব কিছুর মোকাবেলা করেন তিনি। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেন মহাবিজয়।

এ বিজয়ের পথে তিনি নেতৃত্ব দান করেন নারী ও পুরুষের সম্মিলিত এক সুশৃংখল জনগোষ্ঠীর। এরা ছিলেন সেই সব লোক, যারা ঈমানের পথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ নির্দেশিত ঈমান ও সত্য দীনের আলোকে তাদের চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও আচার আচরণ পরিশুদ্ধ করেন। তাদের পবিত্র করেন শিরক ও পাপাচারের যাবতীয় পংকিলতা থেকে এবং তাদেরই দ্বারা গঠন করেন এক সুশংখল বিপ্লবী সংগঠন। তাঁর নেতৃত্ব ছিলো সর্বজন নন্দিত। তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বের নিন্দা করতে পারেনি।

মহান নেতা মুহাম্মদ সা.-এর জীবন ছিলো এক মহাসমুদ্রের মতো। অনন্ত কাল আহরণ করলেও এ সমুদ্রের মণিমুক্তা শেষ হবে না কখনো। মানুষের পূর্ণাংগ জীবনধারার তিনি পরিপূর্ণ আদর্শ।

তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন মানব সমাজের। নেতৃত্ব দিয়েছেন আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পরিচালনার। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী আন্দোলনের তিনি আদর্শ। ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের তিনিই মডেল।

কিয়ামত পর্যন্ত যারাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাইবে, তাদেরকে অবশ্যি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাদের আন্দোলন অবশ্যি তাঁর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। তাঁর জীবন সমুদ্রের এদিকটি থেকেই এখানে আমরা আহরণ করতে চাই কিছু মণিমুক্তা। আর সেগুলোর মালা গাঁথতে চাই এভাবে :

১. নেতা হিসেবে রসূলুল্লাহর সা.-এর আত্মগঠন পদ্ধতি।

২. তাঁর পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

৩. তাঁর নেতৃত্বসূলভ অসাধারণ গুণাবলী।

৪. তাঁর সংগঠনের কয়েকটি মৌলনীতি।

৫. তাঁর দাওয়াত দান পদ্ধতি।

৬. বিরোধীদের সাথে তাঁর আচরণ।

৭. সহকর্মীদের সাথে তাঁর আচরণ।

ইসলামি আন্দোলনের মূল নেতা হিসেবে তাঁর জীবনের এদিকগুলোর প্রতিটিই ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে। এর প্রতিটি বিষয়েই কুরআন হাদিসে রয়েছে ব্যাপক যুক্তি প্রমাণ, উদাহরণ উপমা। এখানে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। হ্রস্ব আলোকপাত করেই ক্ষান্ত হবো।

৩. নেতা হিসেবে রসূলুল্লাহ সা.-এর আত্মগঠন পদ্ধতি।

মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সা.-কে রিসালাত দান করেন। আর রিসালাত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নেতৃত্ব। নবুয়্যত ও রিসালাত ভিত্তিক এ নেতৃত্ব আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেন তাঁর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করার জন্যে। নবী রসূলগণই আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূল নেতা। নবীদের পর উম্মতের মধ্যে যারা ইসলাম প্রচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দায়িত্ব পালন করেন, তাদের নেতৃত্ব হতে হবে নবীর নেতৃত্বের অনুগামী।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. শেষ নবী। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তিনি ইসলামি নেতৃত্বের শাশ্বত মডেল ও অনির্বাণ আদর্শ। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে।

আল কুরআনের অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর নির্দেশ মাফিক নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত অহী আল কুরআনের সাথে নিজের হৃদয় মনের সুনিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করেন। কুরআনই ছিলো তাঁর মূল প্রশিক্ষক। এ কুরআনই তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে তৈরি করেছে। গড়েছে তাঁকে নিখুঁত নেতা হিসেবে। মহিমান্বিত করেছে তাঁকে অসাধারণ মানবিক গুণাবলী দ্বারা। কুরআন তাঁর চলার পথ আলোকিত করেছে। তিনি যা জানতেন না, তা তাঁকে জানিয়েছে। কুরআন তাঁকে দিয়েছে অসাধারণ হিকমত আর মর্মস্পর্শী কথা বলার যোগ্যতা। কুরআন তাঁকে দিয়েছে সাহস, দৃঢ়তা ও বীরত্ব। কুরআন ছিলো তাঁর সর্বক্ষণের সাথি। দেহে রক্ত প্রবাহের মতোই তাঁর হৃদয় ও যবানে প্রবহমান ছিলো আল কুরআন।

জ্ঞানার্জনের দুর্নিবার আকাংখা ছিলো তাঁর আত্মগঠনের অন্যতম প্রক্রিয়া। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন : 'রাব্বি যিদনি ইলমা- প্রভু, আমার

জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও।' তাঁর নিকট অহি নাযিল হতো আর তৃষ্ণার্ত মরুচারীর মতোই তিনি তা এক ঢোকে পান করতে চাইতেন।

রাত কাটাতেন তিনি প্রভুর সান্নিধ্যে সালাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন রাব্বুল আলামীনের কালাম। নিজেকে নিয়ে যেতেন স্বীয় রবের একান্ত সান্নিধ্যে। তাঁর মনিব তার প্রতি বাড়িয়ে দিতেন স্বীয় নুসরত ও রহমতের হাত।

উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, ঘুমোতে জাগতে, মোট কথা প্রতিটি মুহূর্তে তিনি হৃদয় মনকে সজীব সতেজ রাখতেন প্রভুর স্মরণে। তাঁর কণ্টাকাকীর্ণ চলার পথে সবরই ছিলো তাঁর পাথেয়। সবরের পর সবর তাঁকে সোনার মানুষ বানিয়ে ছাড়ে।

এসব প্রক্রিয়ায় তিনি নিজেকে গঠন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে। আর এভাবেই তিনি আরোহণ করেন মানবতার স্বর্ণ শিখরে। এভাবে নিজেকে গড়ার মাধ্যমে তিনি অর্জন করেন যে অসাধারণ যোগ্যতা, তা দিয়েই পরিচালনা করেন ইকামতে দীনের আন্দোলন। এহেন নেতৃত্বকেই আল্লাহ তায়ালা 'সিরাজাম মুনীরা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলামি আন্দোলনের নেতাকে এভাবেই আত্মগঠন করতে হয়।

৪. রসূলুল্লাহ সা. পরিচালিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব রসূলুল্লাহ সা.-কে অর্পণ করেন, তারই নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে তিনি নিজেকে এভাবে গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলন ছিলো পৃথিবীর সকল আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক মহান আন্দোলন। আমরা এখানে তাঁর সে মহান আন্দোলনের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি :

১. আল্লাহর অভিভাবকত্ব : এ আন্দোলনের অভিভাবক, সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আন্দোলনের মূল গাইডেন্স আসতো স্বয়ং তাঁরই নিকট থেকে। আন্দোলনকারীরা তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে সর্বস্ব ও সর্বোচ্চ কুরবানীর জন্যে থাকতেন সদাপ্রস্তুত। তারা তাঁরই কাছে সাহায্য চাইতেন। তিনি তাদের সান্ত্বনা দিতেন, উৎসাহ প্রদান করতেন। করতেন সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান :

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

অর্থ: "আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৫৭)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

অর্থ: "আমি অবশ্য অবশ্যি আমার রসূলদের এবং ঈমানদারদের সাহায্য করবো পৃথিবীর জীবনে এবং পরকালেও যখন সাক্ষী দণ্ডায়মান হবে।" (সূরা ৪০ : ৫১)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

"হে নবী! তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত সবর করো। তুমি তো আমারই দৃষ্টি পথে (পৃষ্ঠপোষকতায়) রয়েছো।" (সূরা ৫২ আত্তুর : আয়াত ৪৮)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ •

অর্থ: "মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" (সূরা ৩০ আর রুম : ৪৭)

২. রসূলের নেতৃত্ব : এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসূল। তিনি তো সেই নেতা, যার নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দাতা স্বয়ং আল্লাহ। তিনি তাঁর অনুগ্রহ প্রদান, অহি ও আল কুরআন নাযিল এবং পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর রসূলকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দান করেন। মূলত অহি তথা কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে ইসলামি নেতৃত্বের গাইড। আর তাঁর সবচাইতে বড় পাথেয় ছিলো আল্লাহর অনুগ্রহ 'ওয়া কা-না ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা-আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট।'

৩. সার্বজনীন দাওয়াত : এ আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিলো গোটা পৃথিবী। সমগ্র মানব জাতির প্রতি ছিলো তার আহ্বান। গোটা মানব জাতিকে সে আল্লাহর দাসত্ব ও রসূলের নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানায়। তার এ আহ্বান কোনো বংশ, গোত্র, জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। তা ছিলো বিশ্বময়, সর্বজনীন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا •

অর্থ: "আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।" (সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ২৮)

৪. জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার বিপ্লব : এ আন্দোলন মানুষকে মূর্খতা থেকে জ্ঞানের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। এখানে জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য। এর সূচনা হয়েছে– 'ইকরা' (পড়ো) দিয়ে। আর প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে অহীর জ্ঞান। এ জ্ঞান মানুষের ধ্যান ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করে; তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ভিত্তিক এক শাশ্বত আকিদা বিশ্বাসের উপর নেতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

৫. সংগঠন ও শৃংখলা : রসূলুল্লাহ সা.-এর আন্দোলন ছিলো খুবই সুশৃংখল, সুসংহত ও সুসংগঠিত। তিনি ছিলেন সংগঠনের নেতা। সাহাবায়ে কিরাম রা. ছিলেন কর্মী বাহিনী। নেতার আনুগত্য ছিলো ফরয। সাংগঠনিক শৃংখলা ভঙ্গ করা ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

• أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থ: "তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আল্লাহর রসূলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৫৯)

৬. পূর্ণাংগতা : এ আন্দোলনের দাওয়াত ছিলো মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিব্যাপ্ত। এ আন্দোলন যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা গোটা মানবজীবনকে তার অধীনে সমন্বিত করে দেয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব সাধনই এ আন্দোলনের লক্ষ্য।

৭. দীন ও দুনিয়ার সমন্বয় : এ আন্দোলন মানুষের দীন ও দুনিয়ার কাজকে এক করে দিয়েছে। সে দুনিয়ার সমস্ত কাজকে দীনি বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে চায়। এভাবে দুনিয়ার সমস্ত কাজই দীনি কাজে পরিণত হয়ে যায়। মূলত এ সমন্বয় ছাড়া মানব জীবনে পূর্ণাঙ্গতা আসতে পারে না।

৮. তাকওয়াভিত্তিক পজিশন : রসূলুল্লাহর আন্দোলনে আল্লাহভীতি তথা তাকওয়া এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই ছিলো যোগ্যতার মাপকাঠি। এদিক থেকে যিনি যতোটা অগ্রসর, আন্দোলনে তিনি ততোটা মর্যাদাসম্পন্ন।

• إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ: "তোমাদের অধিক তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান।" (সূরা ৪৯ হুজুরাত : আয়াত ১৩)

৯. নেতৃত্বের প্রতি লোভহীনতা : এখানে নেতৃত্ব এমন এক দায়িত্ব যার জন্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ জবাবদিহির ভয় লোকদেরকে নেতৃত্বের প্রতি লোভহীন করে গড়ে তোলে। নেতৃত্বলোভী ব্যক্তিকে এ আন্দোলনে কোনো পদ দেয়া হয় না। রসূল সা. বলেছেন : 'নেতৃত্ব প্রার্থীদের জন্যে কোনো পদ এখানে নেই।'

১০. ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ : এ আন্দোলনের কর্মীরা তাদের একই আকিদা বিশ্বাসের কারণে পরস্পরের ভাই হয়ে যায়। এ ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হলো ঈমান আর এর বৈশিষ্ট্য হলো পরস্পরের প্রতি দয়া মমতা (রুহমাউ-বাইনাহুম)।

১১. চারিত্রিক বিপ্লব : এ আন্দোলন মানুষের মধ্যে চিন্তার বিপ্লবের সাথে সাথে চরিত্রের বিপ্লবও সৃষ্টি করে দেয়। আরবের বর্বর জিঘাংসু নিষ্ঠুর মানুষগুলোকে এ আন্দোলন সোনার মানুষ বানিয়ে দিয়েছিল।

১২. সমাজ বিপ্লব : আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজ বিপ্লব সাধিত করা ছিলো এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

৫. রসূলুল্লাহর নেতৃত্বসুলভ অসাধারণ গুণাবলী

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, রসূলুল্লাহ সা. নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ কিভাবে লাভ করেছেন। দুনিয়ার সকল নেতার মধ্যেই নেতৃত্বের গুণাবলী কম বেশি থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী অসাধারণ পূর্ণতা লাভ করে। মানবিক গুণাবলী তাঁর মধ্যে যতোটা উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, তার নজীর আমাদের জানা পৃথিবীতে নেই আর থাকতেও পারে না। স্বয়ং তাঁর স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন, "ওয়া ইন্নাকা লা'আলা খুলুকিন আযীম– হে নবী, অবশ্যি তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী।" আমরা এখানে তাঁর নেতৃত্বসুলভ অসাধারণ গুণাবলীর কয়েকটি মৌলিক দিক উল্লেখ করছি। পৃথিবীর সকল মানুষের চাইতে তার মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উৎকর্ষতা লাভ করে :

০১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি পরম ভালোবাসা, তাঁর ব্যাপারে চরম ভয় এবং তাঁর প্রতি অসীম আনুগত্য।
০২. সুখ ও সম্পদের সীমাহীন কুরবানি।
০৩. দৃঢ়তা, অটলতা ও আস্থাশীলতা।
০৪. বীরত্ব, বাহাদুরি, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা।
০৫. দূরদৃষ্টি, অন্তরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা।
০৬. কথা ও কাজের অতুলনীয় সামঞ্জস্য।
০৭. ধৈর্য, সবর ও সহনশীলতা।
০৮. মহত্ত্ব ও উদারতা, বিরাটত্ব ও বিশালতা।
০৯. দয়া, কোমলতা, অনুগ্রহ, বিনয়, ক্ষমা, সহানুভূতি ও বদান্যতা।
১০. মানুষের কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্যে চরম হৃদয়াবেগ ও পেরেশানি।
১১. আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা।
১২. পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা।
১৩. স্বচ্ছতা, সত্যপ্রিয়তা, স্পষ্টবাদিতা, ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা।

৬. রসূলুল্লাহর সংগঠনের কয়েকটি মৌলনীতি

আগেই বলেছি, রসূলে আকরাম সা.-এর আন্দোলন ছিলো সুসংগঠিত। বিশৃংখল লাগামহীন জনতার সমাবেশ এটা ছিলনা। এ আন্দোলন ছিলো সম্পূর্ণ সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক। সাথি ও সহকর্মীরা ছিলেন নেতার আনুগত্যের এক মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর সংগঠনের কতিপয় মৌলিক নীতি ছিলো নিম্নরূপ :

১. নেতা ও নীতির প্রতি আনুগত্য।
২. পরামর্শভিত্তিক ফায়সালা।
৩. ব্যক্তিগত মতের কুরবানি।
৪. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা।
৫. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা ও সহযোগিতা।
৬. অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান।
৭. পারস্পরিক ক্ষমা ও উদারতা।
৮. মোহাসাবা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।
৯. সীসা ঢালা প্রাচীরের গাঁথুনির মতো অটুট ঐক্য।
১০. উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অটুট অংগীকার।

৭. রসূলুল্লাহর দাওয়াত দান পদ্ধতি

মহান নেতা রসূলুল্লাহ সা. মানুষকে কিভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবেন, সে বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে সময়কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বহু নির্দেশিকা দান করেন। সেই সাথে যোগ হয় রসূলে করীমের স্বভাবগত কোমলতা, মাধুর্য ও সৌন্দর্যবোধ। তাই তাঁর দাওয়াত ছিলো অভাবনীয় প্রভাবশালী ও আকৃষ্টকারী। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তিনি দাওয়াত দানে যেসব পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তার কয়েকটি দিক আমরা এখানে উল্লেখ করছি :

০১. কথার সৌন্দর্য, মাধুর্য, কোমলতা ও আবেদনশীলতা।
০২. হিকমাহ, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকৌশল অবলম্বন।
০৩. উত্তম ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দান এবং উপকারী বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ।
০৪. বিতর্কের পথ পরিহার করে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে হৃদয়-মন ও বুদ্ধি বিবেকের কাছে আবেদন পেশ।
০৫. সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণের নীতি অবলম্বন।

০৬. চাপ প্রয়োগ, জোর জবরদস্তি ও দারোগাগিরির পথ বর্জন।

০৭. যাদের মন গলবে তাদের পিছে বেশি বেশি সময় দান।

০৮. আগ্রহীদের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ।

০৯. ভালো কথা দিয়ে মন্দ কথার জবাব দান।

১০. সদাচার দ্বারা বদাচরণের জবাব দান।

১১. বিনয়, সহৃদয় ও উদারতার নীতি অবলম্বন।

১২. সবর ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ।

১৩. সহজ পন্থা গ্রহণ, কঠোরতা বর্জন।

১৪. উত্তেজনা বর্জন এবং শান্ত ধীর মস্তিষ্কে কর্ম সাধন।

১৫. সুন্দর, চমৎকার ও আকর্ষণীয় বলিষ্ঠ চরিত্রের নমুনা পেশ।

১৬. সাহসিকতার সাথে দাওয়াত দান ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।

১৭. কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দান।

১৮. আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান।

১৯. দাওয়াতের সূচনায় পরকালের প্রতি গুরুত্বারোপ।

২০. ক্ষমার নীতি গ্রহণ ও প্রতিশোধের নীতি বর্জন।

এ পন্থাগুলোর কথা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে জানতে পেরেছি। দাওয়াতি কাজে এসব পন্থা অবলম্বনের জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর রসূলকে নির্দেশ দান করেন।

৮. বিরোধীদের সাথে তাঁর আচরণ

মহান নেতা রসূলে করিম সা.-এর আন্দোলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। এ আন্দোলনের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সে তার বিরোধীদেরকে সংগঠিত করে দেয়। আর বিরুদ্ধবাদীরা এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বাধার বিন্দাচল সৃষ্টি করে। তারা বেছে নেয় হীন ষড়যন্ত্রের পথ। তারা উদ্যত হয় এ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তাদের বিরোধিতা মোটামুটি চার প্রকার :

১. মৌখিক বিরোধিতা (মানসিক যাতনা, জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি)।

২. নির্যাতন (শারীরিক যাতনা, জনমনে ভীতি সৃষ্টি)।

৩. ষড়যন্ত্র।

৪. সংঘর্ষ।

এসব বিরোধিতার মুকাবিলায় রসূলুল্লাহ সা. এমন উচ্চস্তরের নীতিমালা গ্রহণ করেন যার ফলে বিরুদ্ধবাদীরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে যায় এবং তিনি অর্জন করেন মহা-বিজয়ের গৌরব। আমরা তাঁর সেই মহান নীতি ও আচরণের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি :

১. ধৈর্য, সবর ও সহনশীলতা।
২. রাগ ও উত্তেজনা বর্জন এবং বিতর্ক পরিহার।
৩. ভালো দিয়ে মন্দের জবাব দান।
৪. বিরোধিতার জবাবে শত্রুর উপকার ও কল্যাণ সাধন।
৫. বিরোধীদের জন্যে হিদায়াতের দোয়া।
৬. বিরোধীদের হীন ও ঘৃণ্য আচরণের মোকাবিলায় উদারতা ও ক্ষমা।
৭. বলিষ্ঠতার সাথে বিরোধীদের আক্রমণের মোকাবিলা।

আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে নবী করিম সা. কে এসব নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেন। তিনি এরূপ আচরণের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবিলা করেন। এর ফলে অধিকাংশ জানের শত্রু প্রাণের বন্ধু হয়ে যায়। অবশিষ্ট নিকৃষ্ট শত্রুরা তাঁর বলিষ্ঠ মোকাবিলায় নিষ্প্রাণ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এভাবেই তিনি এগিয়ে যান মহাবিজয়ের দিকে।

৯. সহকর্মীদের সাথে তাঁর আচরণ

নেতা হিসেবে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সহকর্মীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন? কেমন ছিলেন তিনি আপন সহকর্মীদের প্রতি? কুরআন বলে তাদের প্রতি তিনি ছিলেন :

০১. রাউফুর রাহীম (দয়ার সাগর) (সূরা আত-তাওবা : আয়াত ১২৮)।
০২. তাদের অসুবিধায় তিনি হতেন চরম মর্মাহত। (ঐ)।
০৩. তাদের সুখ ও কল্যাণের পরম লোভী ছিলেন তিনি। (ঐ)।
০৪. তাদের প্রতি ছিলেন তিনি পরম অমায়িক। আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯।
০৫. তাদের দান করতেন যথার্থ মর্যাদা আর ভালোবাসতেন গভীরভাবে। (সূরা আনফাল : আয়াত ৬২-৬৪, সূরা শোয়ারা : আয়াত ২১৫)।
০৬. তাদের সাথে তিনি কখনো গর্ব-অহংকার করতেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী আদর্শ মানুষ।
০৭. নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাথিদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন।
০৮. তিনি তাঁর নিজের প্রতি কৃত সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন।

৯. তিনি নিজের প্রত্যেক সহকর্মীর সাথে তার সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী আচরণ করতেন।

১০. তাদের শিক্ষাদান ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাদের প্রতিভার বিকাশ সাধনে তিনি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

১১. তিনি তাদের দোষ ত্রুটি ধরে দিতেন এবং সব সময় উপদেশ দিতেন।

১২. তিনি তাদের এমন কল্যাণকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে, তারা প্রত্যেকেই তাঁর সাথে একান্ত নৈকট্যের সম্পর্ক অনুভব করতেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নেতার সহকর্মীদেরকে তার প্রতি এতোটা ভক্ত অনুরক্ত দেখা যায়নি, যতোটা দেখা গেছে মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি তার সহকর্মীদের আর এটা ছিলো তাদের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আচরণেরই ফল।

মুমিনের সকল কাজের আদর্শ রসূলুল্লাহ সা.। 'আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ'– মহান আল্লাহর এই মহাসত্য বাণী শুধু কথার কথাই নয়। বাস্তবেও সকলেই তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন যেমনি তাঁর অনুসারীরা, তেমনি তাঁর বিরোধীরাও।

ইসলামি ব্যবস্থায় মুহাম্মদ সা.-এর নেতৃত্বের অনুগামী হওয়া অপরিহার্য। নেতৃত্বের মডেল বা নমুনা হিসেবে তাঁকেই মেনে নিতে হবে। তাঁর নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। কুরআন এবং মুসলিম উম্মাহ্ই কেবল তাঁর শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেয়নি, দিয়েছে অমুসলিম মনীষীরাও। কেবল মাইকেল হার্টের কথাই বলতে চাই, যিনি বিশ্বের সর্বকালের একশত সেরা মনীষীর জীবনী লিখেছেন। এ তালিকায় তিনিও মুহাম্মদ সা. এর স্থানই এক নম্বরে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

"মুহাম্মদ সা.-এর সাফল্যের মধ্যে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয়বিধ প্রভাবের এক অতুলনীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ জন্যে সংগতভাবেই তাঁকে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।"

"অতি সাধারণ অবস্থায় জীবন শুরু করে তিনি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিশ্বাসের প্রবর্তন করেন এবং অত্যন্ত সফল একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আজকে তাঁর মৃত্যুর তেরশো বছর পরেও তাঁর প্রভাব পৃথিবীতে ব্যাপক ও প্রবল।"

* * *

৩

মদিনা সনদ

মানব ইতিহাসে মানবাধিকারের পয়লা সনদ

১. ভূমিকা

হিজরতের পর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবর্তনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলাম কায়েমের পর্যায় ক্রমিক পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে তাঁর প্রণীত মদিনা সনদ মানব ইতিহাসের এক অম্লান সোনালি স্মারক। মদিনা আগমনের পর পরই সম্পাদিত তাঁর প্রধান প্রধান কয়েকটি কার্যক্রমের মধ্যে মদিনা সনদ প্রণয়ন অন্যতম।

মদিনা সনদ মূলত একটি চুক্তি। এই চুক্তি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের অধিকার সংরক্ষণ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ সম্বলিত এক অনন্য দলিল।

ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ কেউ সংক্ষিপ্ত এবং কেউ বিস্তারিত আকারে এ দলিলের বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীগণ এই দলিলের উপর ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। তাঁরা এ দলিলকে ' মদিনা সনদ' (Charter of Madina) বলে উল্লেখ করেছেন। মন্টোগোমারি ওয়াট তাঁর 'মুহাম্মদ এ্যাট মদিনা' গ্রন্থে এই দলিলকে 'The Constitution of Madina' অর্থাৎ 'মদিনার সংবিধান' বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে এটি ছিলো মদিনা রাষ্ট্রের সংবিধান। এটির মাধ্যমেই মদিনা রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মূল দলিলে এটিকে 'কিতাবুন নবী' উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ- নবী মুহাম্মদ সা. কর্তৃক লিখিতভাবে সম্পাদিত কিতাব বা দলিল।

২. মদিনা সদন কোন্ সালে প্রণীত হয়?

এই দলিল কবে সম্পাদিত হয়? কেউ কেউ বলেছেন বদর যুদ্ধের পরে এটি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু এ বক্তব্য ঠিক নয়। ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশাম রচিত সীরাত গ্রন্থাবলীতে হিজরতের পর পর রসূলুল্লাহ সা. যেসব কার্যক্রম সম্পাদন করেন এই দলিল প্রণয়নকে তার অন্যতম বলে গণ্য করা হয়েছে।

হিজরতের পর পর রসূল সা. ধারাবাহিকভাবে কুবার মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা, মদিনা সনদ সম্পাদন এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপনের কার্য সম্পাদন করেন।[১] এই কাজগুলো হিজরতের পর একেবারে প্রথম দিকেই এবং প্রথম বছরই সম্পাদিত হয়।

ঐতিহাসিক হিসাব মতে রসূল সা. মক্কা থেকে হিজরত করে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মদিনার কূবা পল্লীতে পৌছেন। এটা ছিলো ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর। অবশ্য মতান্তরে ২২ অথবা ২৪ কিংবা ২৯ সেপ্টেম্বর।

তাই মদিনা সনদ প্রণীত হয়েছে প্রথম হিজরি সনে এবং ইংরেজি ৬২২ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে অথবা ৬২৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে।

৩. মদিনা সনদের অন্তরভুক্ত জনগোষ্ঠী

রসূলুল্লাহ সা. যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসেন, তখন মদিনায় মোটামুটি চার প্রকার জনগোষ্ঠী বর্তমান ছিলো :

১. মদিনার অধিবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠী।

২. হিজরত করে আসা কুরাইশ, অকুরাইশ, আরব, অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠী।

৩. ইহুদি জনগোষ্ঠী। এদের কয়েকটি গোত্র ছিলো এবং এরা ছিলো বহিরাগত।

৪. মদিনার আদিবাসী মুশরিক জনগোষ্ঠী। (তবে হিজরতের আগে থেকে আরম্ভ করে এরা দ্রুত গতিতে মুসলিম হয়ে যায়। এ সময় পর্যন্ত যারা মুসলিম হয়নি, তাদের তেমন প্রতিপত্তি ছিলো না।)

রসূলুল্লাহ সা. এই সকল জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে মদিনা চুক্তির মাধ্যমে মদিনা রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত করেন।

এই চুক্তিতে মদিনার কোনো ভৌগলিক সীমারেখা উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন পরিচয়ের জনগোষ্ঠীকে। ভবিষ্যতে যেসব মুসলিম হিজরত করে মদিনায় আসবে, তাদেরকেও চুক্তির অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। চুক্তিপত্রে এর অন্তরভুক্ত জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

১. কুরাইশ এবং ইয়াস্‌রিবের (মদিনার) মুমিন-মুসলিম জনগোষ্ঠী।

২. যারা তাদের অনুসারী (অর্থাৎ- মুসলিম) হয়ে মদিনায় আসবে-তারা।

৩. এবং যারা তাদের সঙ্গে (দেশের নিরাপত্তা বিধানে) অংশ নেবে (অর্থাৎ মুশরিক ও ইহুদি জনগোষ্ঠী)।

এই সনদ ছিলো অত্যন্ত প্রশস্ত ও ব্যাপক। উপরোল্লেখিত জনগোষ্ঠী এই দলিলের স্বীকৃতি প্রদান করে।

৪. সনদের কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব

মদিনা সনদ মূলত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর দায়িত্বে ও কর্তৃত্বে প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছিল। তাই শুরুতেই এটিকে কিতাবুন নবী বা নবী সা.-এর কিতাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সনদে আল্লাহকে সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

এই সনদে মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহর নবী ও রসূল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাসক, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও কর্তৃত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে এই সনদের অন্তরভুক্ত জনগোষ্ঠী এবং এই সনদের অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁকে একক নেতা হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

৫. নাগরিক অধিকার

এই সনদের মূল পক্ষ কুরাইশ ও মদিনার মুমিন মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং যারা ঈমান এনে মদিনায় হিজরত করে আসবে তারা।

এই সনদে মদিনায় বসবাসকারী বহিরাগত ইহুদিদেরকেও মদিনা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে তাদেরকে শান্তি, শৃংখলা, সততা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বসবাস করতে বলা হয়েছে। তাদেরকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে, বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের শর্তের ভিত্তিতে সকল অমুসলিম এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মিত্র ও আশ্রিতদেরকেও মদিনার নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

৬. মদিনা সনদ (Charter of Madina)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

০১. এটি একটি কিতাব (ফরমান/দলিল/সনদ/সংবিধান/চুক্তি)।

০২. এটি জারি করছেন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

০৩. এটি জারি করা হলো কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলিমদের মধ্যে (পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে)।

০৪. এটি তাদের জন্যেও প্রযোজ্য, যারা (ঈমান এনে) তাদের অনুসারী হবে এবং তাদের সাথে মিলিত হবে।

০৫. এটি তাদের জন্যেও প্রযোজ্য, যারা তাদের সাথে (পক্ষে) যুদ্ধে অংশ নেবে।

০৬. এরা সবাই অন্য সকল মানুষের প্রতিকূলে একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ (জাতি)।

০৭. কুরাইশ মুহাজিররা ইসলাম গ্রহণকালীন সময় দিয়্যত ও ফিদিয়ার ক্ষেত্রে যে নিয়ম-প্রথা অনুসরণ করতো, তাদের নিজেদের মধ্যে হত্যার ক্ষেত্রে সেই দণ্ড (ক্ষতি পূরণ) প্রথাই বহাল থাকবে। প্রচলিত নিয়ম ও সুবিচারের ভিত্তিতে তারা নিজেদের মুমিনদের মাঝে বন্দী বিনিময় করবে।

০৮. বনু আউফও তাদের প্রথা অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে পূর্বেকার রক্তমূল্য প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপগোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করবে।

০৯. বনু সায়েদাও তাদের প্রথা অনুযায়ী নিজেদের মধ্যকার পূর্ব রক্তমূল্য (হত্যার ক্ষতিপূরণ) আদান প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপগোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করবে।

১০. বনু হারিস তাদের প্রথানুযায়ী নিজেদের মধ্যকার পূর্ব রক্তমূল্য আদান প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপগোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করবে।

১১. বনু জুশম তাদের প্রথানুযায়ী পূর্বেকার রক্তমূল্য প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপগোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করবে।

১২. বনু নাজজার তাদের প্রথানুযায়ী পূর্বেকার রক্তমূল্য প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপদল মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত রীতি ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করবে।

১৩. বনু আমর ইবনে আউফ তাদের প্রথানুযায়ী পূর্বেকার রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপগোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত বিধি ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে বন্দী মুক্ত করবে।

১৪. বনু নাবীতে তাদের প্রথানুযায়ী তাদের পূর্বেকার রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপগোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করবে।

১৫. বনু আউস তাদের প্রথানুযায়ী তাদের পূর্বেকার রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তাদের প্রত্যেক উপগোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করবে।

১৬. মুমিনরা তাদের কোনো ঋণগ্রস্ত এবং অধিক পোষ্যের কারণে অভাবগ্রস্ত ভাইকে রক্তমূল্য প্রদান এবং বন্দী মুক্তি মূল্য প্রদানে (আর্থিক) সাহায্য না করে (অসহায় অবস্থায়) ফেলে রাখবে না।

১৭. কোনো মুমিন অপর মুমিনের মিত্র বা আশ্রিতের বিরুদ্ধে যাবে না।

১৮. আল্লাহভীরু মুমিনরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। তাদের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেবে, যারা দাপটের সাথে মানুষের উপর যুলম-অত্যাচারে লিপ্ত হয়, যারা অপরাধ করে, যারা সীমালংঘন করে এবং যারা মুমিনদের মধ্যে (সামাজিক) বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে- এমনকি অপরাধী নিজের সন্তান হলেও।

১৯. কোনো মুমিন কাফিরের পক্ষে অপর মুমিনকে হত্যা করবে না।

২০. কোনো মুমিন অপর মুমিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করবে না।

২১. (এই রাষ্ট্রে) মুসলিমদের মতো অনুগত অমুসলিমদের নিরাপত্তার অধিকারও একই সমান।

২২. একজন নগণ্য অমুসলিমের নিরাপত্তার দায়িত্বও মুসলিমদের উপর।

২৩. অপর লোকদের প্রতিকূলে মুমিনরা পরস্পরের বন্ধু, মিত্র ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকবে।

২৪. ইহুদিদের মধ্যে যে আমাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করবে, সে সাহায্য ও সমান অধিকার লাভ করবে। তার উপর কাউকে যুলম করতে দেয়া হবে না এবং তার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হবে না।

২৫. সকল মুমিনের নিরাপত্তা বিধান একই। আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোনো মুমিন অপর মুমিন ছাড়া আর কারো সাথে এমন কোনো চুক্তি করবে না, যা তাদের মধ্যে সমতা ও সুবিচারের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবেনা।

২৬. আমাদের প্রতিটি যোদ্ধাদল একে অপরকে অনুসরণ করবে।

২৭. মুমিনরা আল্লাহর পথে ঝরানো রক্তের জন্যে পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেবে।

২৮. আল্লাহভীরু মুমিনরাই সর্বোত্তম এবং সঠিক দীন ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২৯. (মদিনার) কোনো মুশরিক কোনো কুরাইশ (কাফিরকে) জান ও মালের নিরাপত্তা দেবে না এবং মুমিনের বিপক্ষে গিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না।

৩০. যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে হত্যা করবে এবং তা সুপ্রমাণিত হবে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। তবে নিহতের উত্তরাধিকারী সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। মুমিনরা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। মুমিনদের জন্যে হত্যাকারীর বিরোধিতা ছাড়া অন্য কোনো পথ অবলম্বন করা বৈধ নয়।

৩১. এই সহীফায় (সনদে) সন্নিবেশিত বিধিমালার স্বীকৃতিদানকারী এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণকারী কোনো ব্যক্তির জন্যে কোনো বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করা ও আশ্রয় দেয়া বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এমন কাউকেও সাহায্য করবে, কিংবা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে- তার প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অভিশাপ ও রোষানল বর্ষিত হোক। তার পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ কিংবা বিনিময় গ্রহণযোগ্য নয়।

৩২. তোমাদের মধ্যে কখনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্যে মহামান্য ও মহামর্যাদাবান আল্লাহ্র দিকে এবং মুহাম্মদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

৩৩. যতোদিন যুদ্ধ চলবে, ইহুদিরা মুমিনদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

৩৪. বনি আউফের ইহুদিরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ (একই দলভুক্ত) বলে গণ্য হবে।

৩৫. (এই চুক্তির ভিত্তিতে একই দলভুক্ত হলেও) ইহুদিরা তাদের ধর্ম পালন করবে, আর মুসলিমরা জীবন যাপন করবে তাদের দীনের ভিত্তিতে।

৩৬. (মুসলিম ও ইহুদিরা যেমন নিজ নিজ দীন-ধর্ম পালন করবে, ঠিক তেমনি তাদের) মিত্র এবং আশ্রিতরাও নিজ নিজ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। তবে যুলম ও অপরাধ যে-ই করবে সে কেবল নিজের আর নিজ পরিবার বর্গেরই ক্ষতি সাধন করবে।

৩৭. বনি নাজ্জারের ইহুদিদের মর্যাদা ও অধিকার বনি আউফের ইহুদিদের সমতুল্য।

৩৮. বনি হারিসের ইহুদিদের অবস্থাও বনি আউফের ইহুদিদের সমতুল্য।

৩৯. বনি সায়েদার ইহুদিদের অবস্থানও বনি আউফের ইহুদিদের সমতুল্য।

৪০. বনি জুশম-এর ইহুদিদের অধিকারও বনি আউফের ইহুদিদের সমতুল্য।

৪১. বনি আউসের ইহুদিদের মর্যাদাও বনি আউফের ইহুদিদের সমতুল্য।

৪২. বনি সা'লাবার ইহুদিদের অবস্থানও বনি আউফের ইহুদিদের মতো।

৪৩. এইসব গোত্রের কেউ যদি যুলম, কিংবা অপরাধ করে, তবে সে কেবল নিজের আর নিজ পরিবারেরই ক্ষতি সাধন করবে।

৪৪. বনি সা'লাবার শাখা গোত্র জাফানার মর্যাদা বনি সা'লাবারই অনুরূপ।

৪৫. বনি শুতাইবার মর্যাদা বনি আউফের ইহুদিদের অনুরূপ। (তাদের কাছে) অপরাধের পরিবর্তে সততা আর আনুগত্য কাম্য।

৪৬. সা'লাবার মিত্র ও আশ্রিতদের মর্যাদা তাদের নিজেদের অনুরূপ।

৪৭. ইহুদিদের সকল শাখা গোত্রের মর্যাদা তাদের নিজেদের মর্যাদার অনুরূপ।

৪৮. তাদের (ইহুদিদের) কোনো ব্যক্তিই মুহাম্মদ সা.-এর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে বের হবে না।

৪৯. কারো ক্ষত-আঘাতের প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে তাকে বাধা দেয়া হবে না। কিন্তু যে কেউ বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে, সে জন্যে সে এবং তার পরিবার দায়ী হবে। তবে কেউ মযলুম (নির্যাতিত) হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। মযলুমের প্রতি আল্লাহই অধিক দয়াশীল।

৫০. (রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষায়) ইহুদিরা নিজেদের ব্যয়ভার বহন করবে, আর মুসলিমরা মুসলিমদের।

৫১. এই দলিলের অন্তরভুক্তদের কেউ আক্রান্ত হলে সে অবস্থায় সবাই একে অপরকে সাহায্য করবে।

৫২. এই দলিলের অন্তরভুক্ত লোকেরা সবাই একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। কেউ কারো বিরুদ্ধে অপরাধে লিপ্ত হবে না।

৫৩. কোনো ব্যক্তি অপর কারো অপরাধের সহযোগী হবে না। তবে মযলুমকে সাহায্য করা যাবে।

৫৪. (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে) মুমিনরা যতোদিন যুদ্ধরত থাকবে, সেসব যুদ্ধে মুমিনদের সাথে ইহুদিরাও ব্যয়ভার বহন করবে।

৫৫. এই দলিলে অঙ্গীকারবদ্ধ লোকদের জন্যে ইয়াসরিবের ভূ-খণ্ড সম্পূর্ণ পবিত্র-নিরাপদ।

৫৬. প্রতিবেশী এবং আশ্রিতরা ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তি-বিশৃংখলা ও অপরাধে লিপ্ত না হলে তারা তাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিবেশী হিসেবে এই সনদ গ্রহণকারীদের মতোই নিরাপদ।

৫৭. কোনো নারীকে তার পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না। (কারণ, পরিবারই তার কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রদানের অধিক উপযুক্ত)।

৫৮. এই দলিল গ্রহণকারীদের মধ্যে কখনো যদি কোনো প্রকার বিবাদ, দুর্ঘটনা, কিংবা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তবে তা মীমাংসা করার জন্য রুজু করতে হবে মহামান্য ও মহামর্যাদাবান আল্লাহর দিকে এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সা.-এর দিকে।

৫৯. এই ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ (সবার মধ্যে) অতীব সতর্কতা, সততা ও বিবেকের অনুসরণ দেখতে চান।

৬০. তারা কেউ (কাফির) কুরাইশ এবং কুরাইশের সহযোগীকে আশ্রয় দেবে না।

৬১. ইয়াসরিব আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সবাই পরস্পরকে সাহায্য করবে।

৬২. তাদেরকে যদি সন্ধি স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়, তাহলে তারা সন্ধি স্থাপন করবে এবং তা মেনে চলবে।

৬৩. এ ধরনের সন্ধি স্থাপিত হলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তা মেনে চলা মুমিনদেরও কর্তব্য। তবে দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সাথে সন্ধি করার বিষয়ে আলাদা কথা।

৬৪. যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরা তাদের প্রাপ্য সেই পক্ষ থেকে গ্রহণ করবে, যারা তাদেরকে বাহিনীতে ভর্তি করবে।

৬৫. আউসের ইহুদিরা নিজেরা এবং তাদের আশ্রিতরা সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিলে তাদের মর্যাদা ও অধিকার হবে এই দলিলের অংশীদারদের সমতুল্য এবং তারা এই দলিল গ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে তাদের ন্যায্য অংশ প্রাপ্য হবে।

৬৬. প্রত্যেকেই অপরাধ নয়, সততার অনুসারী থাকবে।

৬৭. অপরাধ যে-ই করবে, তার জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে।

৬৮. আল্লাহ এই দলিলের সত্যতা ও সততার সাক্ষী।

৬৯. এই দলিল যালিম এবং অপরাধী ছাড়া আর কারো জন্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

৭০. যে (মুমিনদের পক্ষে) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, সে নিরাপদ।

৭১. যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না, তবে শান্তিতে মদিনায় অবস্থান করবে, সেও নিরাপদ। কিন্তু যে যুলম এবং অপরাধে লিপ্ত হবে, তার রক্ষা নাই।

৭২. যে সততা ও ন্যায়নীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য ও রক্ষা করবেন এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মদও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।[১]

---

১. আবদুস সালাম হারূণ (মিসর) কর্তৃক সম্পাদিত এবং 'দারুল ফিকর' দামেস্ক থেকে প্রকাশিত 'সীরাতে ইবনে হিশাম' থেকে হুবহু অনুবাদ।

শেষ কথা

রসূলুল্লাহ সা.-এর এই দলিলটি প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের সূত্রে ইবনে হিশাম তাঁর সীরাতুন্নবী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দলিলটি দেখলে বুঝা যায়, ইবনে ইসহাক এটি লিখিত অবস্থায় পেয়েছিলেন। লিখিত দলিলটি তিনি তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ইবনে হিশামও ইবনে ইসহাকের সূত্রে লিখিত দলিলটিই নিজ গ্রন্থে গ্রন্থবদ্ধ করেন। ফলে, দলিলটির সূত্রগত বিশুদ্ধতা সুস্পষ্ট।

মূল দলিলের ধারাগুলোতে নম্বর দেয়া ছিলনা। আমরা অনুবাদ করতে গিয়ে প্রতিটি ধারাকে নম্বর ভিত্তিক লিপিবদ্ধ করেছি। এতে করে প্রতিটি ধারাকে আলাদা আলাদা বুঝতে সহজ হবে।

এই সনদ প্রণীত হবার বহু শতাব্দী পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং জাতিসমূহের মধ্যে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্যে বিভিন্ন সনদ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এই মদিনা সনদই মানবাধিকারের পয়লা সনদ এবং এটি অনন্য, অনুপম আর সর্বাধিক কার্যকর ও সুদূর প্রসারী।

* * *

৪

আদর্শ নেতার শ্রেষ্ঠ ভাষণ

১. বিদায় হজ্জে প্রদত্ত সাংবিধানিক ভাষণ

বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.-এর অনেকগুলো ভাষণের উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন হাদিস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে। তবে সর্বাধিক খ্যাতিমান ভাষণ হজ্জের ভাষণ।

আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে হজ্জ ফরয হবার পর রসূলুল্লাহ সা. একবারই হজ্জ করেছেন। তাঁর এই হজ্জ 'বিদায় হজ্জ' নামে খ্যাত। তিনি এ হজ্জ করেন তাঁর ওফাতের মাত্র তিন মাস পূর্বে। এ হজ্জে তাঁর লক্ষাধিক সাথির (সাহাবীর) সমাবেশ ঘটে। এ হজ্জের ভাষণে তিনি তাঁর সাথিদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সে কারণেই এটিকে তাঁর বিদায়ী হজ্জ বলা হয়।

তিনি তাঁর এই হজ্জ সম্পাদন করেন ১০ হিজরি সনে। ২৬ জিলকদ থেকে ১৪ জিলহজ্জ মোট ১৯ দিন তিনি এ হজ্জের সফরে অতিবাহিত করেন (তবে তারিখের ক্ষেত্রে বিভিন্নজনের বর্ণনায় কিছুটা তারতম্য আছে)। হজ্জ পালন করেন ৮ থেকে১৩ জিলহজ্জের মধ্যে। এটা ছিলো ৬৩২ খৃস্টাব্দ।

এ হজ্জের ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নির্দেশাবলী প্রদান করেন। সেই সাথে প্রদান করেন কতিপয় সোনালি উপদেশ।

এ হজ্জ পালনকালে তিনি তিন চারটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তবে ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে হজ্জের ভাষণ (খুতবা) এবং ১০ জিলহজ্জ মিনায় প্রদত্ত একটি ছোট ভাষণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর হজ্জের ভাষণ বিভিন্ন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। হাদিস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে সাহাবীগণের খণ্ড খণ্ড বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে। এখানে সবগুলো বর্ণনা সমন্বিত করে দেয়া হলো।

তাঁর এই ভাষণে যেহেতু অনেকগুলো সাংবিধানিক দফা রয়েছে, তাই আমরা দফাওয়ারী নম্বর জুড়ে দিলাম। ভাষণ:

১. আল্লাহর প্রশংসা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা কেবল তাঁরই প্রশংসা করছি। আমরা কেবল তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি কেবল তাঁরই কাছে।

২. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা: আমরা নিজেদের দ্বারা নিজেদের অনিষ্ট সাধন থেকে এবং নিজেদের মন্দ কর্ম থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না। কেউ নিজের সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপথে চলার সুযোগ লাভ করলে কেউ তাকে সঠিক পথে আনতে পারে না।

৩. আল্লাহর এককত্ব ও সার্বভৌমত্বের এবং মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের ঘোষণা: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ (সার্বভৌম কর্তা, বিধানদাতা, ত্রাণকর্তা ও উপাস্য) নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রসূল।

৪. এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের অসিয়ত: হে আল্লাহর দাসেরা! আমি তোমাদের কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। অতপর আমার বক্তব্য শুরু করছি।

৫. এটি আমার বিদায়ী ভাষণ: হে জনমণ্ডলি! তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার বক্তব্য শোনো। হয়তো এ বছরের পর এ স্থানে তোমাদের সাথে আমার আর কখনো সাক্ষাত হবে না।

৬. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা: হে জনমণ্ডলি! তোমাদের একজনের জীবন ও সম্পদ আরেকজনের কাছে ঠিক তেমনি পবিত্র ও সম্মানিত, যেমন পবিত্র আজকের এই দিন (হজ্জ বা আরাফার দিন) এবং এই মাস। (অর্থাৎ তোমাদের একের পক্ষে অন্যের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।) তোমাদের প্রভুর নিকট পৌঁছা পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) এ বিধান মেনে চলবে। আমি তোমাদের বার্তা পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

৭. আমানতের নিরাপত্তা: যার কাছে কোনো (কিছু) আমানত (গচ্ছিত) রাখা হয়েছে, সে যেনো সেই আমানত তার মালিককে ফেরত দেয়।

৮. সুদ নিষিদ্ধ ও মওকুফ: সুদ প্রথা নিষিদ্ধ করা হলো। পূর্বের প্রাপ্য সমস্ত সুদ মওকুফ। তোমরা কেবল মূলধনই ফেরত পাবে। সবার আগে আমি আমার চাচা আবদুল মোত্তালিবের পুত্র আব্বাসের সমস্ত সুদ মওকুফ করে দিলাম।

৯. সমস্ত কুসংস্কার রহিত: জেনে রাখো, জাহেলি যুগের সমস্ত কুসংস্কার রহিত করা হলো। এখন সমস্ত কুসংস্কার আমার পদতলে।

১০. খুনের প্রতিশোধযুদ্ধ রহিত: জাহেলি যুগের সকল খুনের প্রতিশোধ দাবি রহিত করা হলো। সবার আগে আমি আমার বংশের আমের বিন রবিয়া বিন হারেছ বিন আবদুল মুত্তালিবের খুনের প্রতিশোধ দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম।

১১. জাহেলি পদ পদবি ও মর্যাদা রহিত: এখন থেকে জাহেলি যুগের সকল পদ পদবি ও মর্যাদা রহিত করা হলো। শুধুমাত্র কা'বার তত্ত্বাবধান ও হাজিদের পানি পান ব্যবস্থার পদ বহাল থাকবে।

১২. হত্যার শাস্তি বিধান: ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময় একশত উট। এক্ষেত্রে কেউ বেশি দাবি করলে তা হবে জাহেলি রীতি।

১৩. শয়তানের আনুগত্য করো না: হে জনতা! দীন (ইসলাম) পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর শয়তান আর এই ভূমিতে উপাসনা লাভ করার আশা করে না। তবে, তোমরা যে ছোটখাটো গুণাহগুলোকে হালকা মনে করো সেগুলোর ক্ষেত্রেও যদি তার আনুগত্য করো তবে সে খুশি হবে। সুতরাং দীনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।

১৪. হারাম মাসকে হালাল করো না: তোমরা মাসের রদবদল করে হারাম মাসকে হালাল করো না।

১৫. স্বামী স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ: হে লোকেরা! স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছো আল্লাহর আমানত হিসেবে। আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে তোমরা তাদের সাথে যৌন মিলন বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো: তোমরা পছন্দ করো না এমন কাউকেও তারা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না, কারো সাথে যৌন অপরাধ করবে না। যদি তারা এমনটি করে বসে, তবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দিতে পারো। তাতেও সংশোধন না হলে এমন হালকা দৈহিক আঘাত করতে পারো, যাতে শরীরে কোনো দাগ না পড়ে। কোনো নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ খরচ করবে না।

তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তারা পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করলে তোমরা প্রচলিত উত্তম রীতিতে তাদের প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী সরবরাহ করবে।

আমি তোমাদের অসিয়ত করছি, তোমরা স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের দায়িত্বে অর্পণ করেছেন। উত্তম পন্থায় তাদের শিক্ষাদান করবে।

জেনে রেখো, আমি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। তোমরা সাক্ষী থাকো।

১৬. একজনের অপরাধে আরেকজন দণ্ডিত হবে নাঃ হে জনতা! শুনে রাখো, একজনের অপরাধের জন্যে আরেকজনকে দণ্ড দেয়া যাবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দণ্ড দেয়া যাবে না। পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দণ্ড দেয়া যাবে না।

১৭. নেতৃত্ব ও আনুগত্যঃ জেনে রাখো, যদি কোনো নাক বোঁচা ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাবের অনুগত থাকে, তবে তোমরা অবশ্যি তার আনুগত্য করবে, আদেশ পালন করবে।

১৮. মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বেরঃ হে জনমণ্ডলি! জেনে রাখো, একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের ভাই। বিশ্বের সকল মুসলিম এক উম্মাহর সদস্য। সুতরাং একজনের সম্পদ অন্যজন অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করবে না।

১৯. বিশ্বমানবের ঐক্য ও সাম্যঃ হে জনমণ্ডলি! নিশ্চয়ই তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একজনই আর তোমাদের আদি পিতাও একজনই। সুতরাং কোনো অনারবীর উপর কোনো আরবীর এবং কোনো আরবীর উপর কোনো অনারবীর কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদার উপরও কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সব মানুষ সমান। সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

২০. মর্যাদার সিঁড়ি তাকওয়াঃ তবে তোমাদের মধ্যে সম্মানিত ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে অধিকতর আল্লাহভীরু এবং ন্যায়নীতিবান।

২১. অধীনস্তদের অধিকারঃ হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের অধীনস্ত দাস দাসী, চাকর চাকরানী ও কর্মচারীদের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। তাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায় আচরণ করো না। তাদের মনে আঘাত করো না।

তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তাই পরতে দেবে।

২২. পিতৃত্ব অস্বীকার করা নিষিদ্ধঃ হে জনমণ্ডলি! পিতৃত্ব অস্বীকার করা নিষিদ্ধ। যে সন্তান তার পিতা ছাড়া অপর কাউকেও পিতা দাবি করবে এবং যে দাস নিজ মনিব ছাড়া অন্য কাউকেও মনিব দাবি করবে, তাদের প্রতি অভিশাপ। বিছানা যার পিতৃত্ব তার।

২৩. ব্যাভিচারীর দণ্ডঃ ব্যভিচারীর শাস্তি (প্রস্তরাঘাতে) মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহর কাছেও তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

২৪. উত্তরাধিকার নির্ধারিতঃ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের উত্তরাধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিশদের জন্যে আর অসিয়ত করা যাবে না।

২৫. দান ঋণ যামিনঃ মনে রেখো, দানের প্রতিদান প্রাপ্য। ঋণ অবশ্যি পরিশোধ করতে হবে। যামিনদার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে দায়ী থাকবে।

২৬. দীনের যথাযথ হেফাযতঃ সাবধান, তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, বাড়াবাড়ি করে অনেক কওম ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার পরে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ো না। তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহর কাছে হাযির হতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে।

২৭. শেষ নবী, শেষ উম্মত, শেষ বিধানঃ হে জনমণ্ডলি! জেনে রাখো, আমার পরে আর কোনো নবীও আসবে না, আর নতুন কোনো উম্মতেরও আবির্ভাব ঘটবে না। সুতরাং, তোমরা কেবল তোমাদের প্রভু এক আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত করবে, দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, মনোতুষ্টির সাথে তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করবে, তোমার প্রভুর ঘরে হজ্জ করবে এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে– এভাবেই তোমরা প্রবেশ করতে পারবে জান্নাতে।

২৮. কুরআন এবং সুন্নাহ্ই মুক্তির পথঃ হে জনমণ্ডলি! জেনে রাখো, আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন সে দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততোদিন তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। তার একটি হলোঃ আল্লাহর কিতাব আল কুরআন, আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

২৯. জ্ঞান পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দাওঃ হে জনমণ্ডলি! তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, তারা অবশ্যি অনুপস্থিত লোকদের কাছে এই ফরমানগুলো পৌঁছে দেবে। কারণ, পরবর্তী যাদের কাছে এসব বার্তা পৌঁছুবে, তাদের অনেকেই, যে পৌঁছাবে তার চাইতে অধিকতর উপলব্ধি করবে।

৩০. সাক্ষ্য গ্রহণঃ আরাফার ভাষণ শেষে রসূলুল্লাহ্ সা. জনমণ্ডলিকে (প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন) জিজ্ঞেস করলেনঃ শোনো, আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা কী জবাব দেবে?

লোকেরা সমস্বরে বললো, আমরা বলবোঃ আপনি আমাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি সঠিকভাবে আমানতের হক আদায় করেছেন। উম্মতের কল্যাণে আপনি সবকিছু করেছেন। সত্যের উপর পড়ে থাকা পর্দা সরিয়ে সত্যকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।"

এ সময় রসূলুল্লাহ্ সা. আকাশের দিকে আংগুল তুলে তিনবার বললেনঃ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো! হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো!, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো!" [২]

রসূলুল্লাহ সা.-এর ভাষণ শেষ হবার পরপরই মহান আল্লাহ নাযিল করলেন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সেই সোনালি দলিলঃ

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا •

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ (perfect) করে দিলাম তোমাদের দীন এবং সমাপ্ত (complete) করলাম আমার নিয়ামত (কুরআন), আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে মনোনীত করলাম দীন হিসেবে।" (সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৩)

২. তবুক প্রান্তরে রসূলুল্লাহর ভাষণ

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ সা. রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি তবুক পৌঁছেন। সৈন্য

---

২. রসূলুল্লাহ সা-এর এই ভাষণ সংকলন করা হলোঃ সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমদ, সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম, মু'আত্তায়ে ইমাম মালেক, সীরাতে ইবনে জরির তাবারি, যাদুল মা'আদ এবং মুহসিনে ইনসানিয়াত গ্রন্থাবলীর সূত্রে। পয়েন্ট আকারে ক্রমিক নম্বর সংযোজন করেছি আমি নিজে। এর দায়-দায়িত্ব আমার।

সমাবেশ করেন। অতপর সেখানে প্রদান করেন এক দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ। এ ভাষণের প্রতিটি বাক্যই ছিলো ব্যাপক তাৎপর্য মণ্ডিত, মর্মস্পর্শী ও প্রভাব বিস্তারকারী। ভাষণে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন :[৩]

০১. সত্যতম বাণী আল্লাহর কিতাব।
০২. সর্বাধিক মজবুত হাতল তাকওয়া নিঃসৃত বাণী।
০৩. সর্বোত্তম আদর্শ ইবরাহিমের আদর্শ।
০৪. সর্বোত্তম নীতিমালা মুহাম্মদের নীতিমালা।
০৫. সবচেয়ে মর্যাদাবান কথা আল্লাহর সম্পর্কে আলোচনা।
০৬. সবচেয়ে কল্যাণময় কাহিনী (ইতিহাস) এই কুরআন।
০৭. সর্বোত্তম বিষয় সংকল্পের দৃঢ়তা।
০৮. সর্বনিকৃষ্ট বিষয় দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন।
০৯. সবচেয়ে কল্যাণময় জীবন পদ্ধতি নবীদের জীবন পদ্ধতি।
১০. সবচেয়ে মর্যাদাবান মৃত্যু শহীদি মৃত্যু।
১১. সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা সঠিক পথ প্রাপ্তির পর ভ্রান্ত পথে চলে যাওয়া।
১২. সবচে' ভালো কাজ সেটি- যা সুফলদায়ক।
১৩. সর্বোত্তম উপদেশ সেটা- যা অনুসরণ করা হয়।
১৪. নিকৃষ্টতম অন্ধতা অন্তরের অন্ধতা।
১৫. উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ হাত পাতার চাইতে দান করা উত্তম)।
১৬. অঢেল বিলাসযোগ্য সম্পদের চাইতে পরিমিত কার্যকরি সম্পদ উত্তম।
১৭. সবচে' নিকৃষ্ট ওযর মৃত্যুকালের ওযর।
১৮. নিকৃষ্টতম লজ্জা কিয়ামতের দিনের লজ্জা।
১৯. কিছু লোক এমন আছে, যারা জুমায় এলেও তাদের অন্তর পেছনে পড়ে থাকে।
২০. কিছু লোক আছে, যারা কখনো আল্লাহর স্মরণ করে, কখনো করে না।
২১. মিথ্যা বলা সবচেয়ে বড় পাপ।
২২. সর্বোত্তম প্রাচুর্য অন্তরের ঐশ্বর্য।
২৩. সর্বোত্তম পাথেয় ন্যায়নীতি।

---

৩. ভাষণের প্রতিটি বাক্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা প্রতিটি বাক্যে নম্বর দিয়ে দিয়েছি।

২৪. জ্ঞানের চূড়া আল্লাহর ভয়।

২৫. অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস।

২৬. আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া কুফুরি।

২৭. (মৃতের জন্যে) চিৎকার করে কাঁদা জাহেলি কাজ।

২৮. প্রতারণা হবে জাহান্নামের জ্বালানি।

২৯. মন্দ নেশা জাহান্নামের পাথেয়।

৩০. কাব্য-গীতিতে রয়েছে ইবলিসি কাজ।

৩১. মদ্যপান পাপের চাবিকাঠি।

৩২. সর্বনিকৃষ্ট খাদ্য এতীমের সম্পদ ভক্ষণ।

৩৩. সৌভাগ্যবান সে, যে উপদেশ গ্রহণ করে।

৩৪. দুর্ভাগা সে, যে মাতৃগর্ভ থেকেই দুর্ভাগা।

৩৫. তোমাদের প্রত্যেকেই চারহাত জায়গার দিকে ফিরে যাবে।

৩৬. মানুষের সকল কাজের ফায়সালা হবে আখিরাতে।

৩৭. শেষ ভালো যার, সব ভালো তার।

৩৮. নিকৃষ্ট বর্ণনা মিথ্যা বর্ণনা।

৩৯. যা ঘটবে তা অতি নিকটে।

৪০. মুমিনকে গালি দেয়া ফাসেকি।

৪১. মুমিনকে হত্যা করা কুফুরি।

৪২. মুমিনের মাংস খাওয়া (গীবত করা) আল্লাহর অবাধ্যতা।

৪৩. মুমিনের সম্পদ তার রক্তের মতোই পবিত্র।

৪৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে বেশি বেশি কসম করে, আল্লাহ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

৪৫. যে ক্ষমা করে দেয়, তাকে ক্ষমা করা হয়।

৪৬. যে কাউকেও নিরাপত্তা দেয়, সে আল্লাহর নিরাপত্তা পায়।

৪৭. যে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেন।

৪৮. যে সম্পদের বিপর্যয়ে ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দেন।

৪৯. যে অপরের দোষ বলে বেড়ায়, আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন।

৫০. যে আল্লাহর অবাধ্য হয়, আল্লাহর শাস্তি তার জন্যে অবধাবিত।[৪]

---

৪. সূত্রঃ বায়হাকি, সিরাতু ইবনু হিশাম, যাদুল মাআদ। বর্ণনাঃ উকবা ইবনে আমের রা.।

৩. জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা

রসূলুল্লাহ সা.-এর একটি ভাষণে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে। সেই মর্যাদাগুলো যেনো শারদীয় নিশিরাতে আকাশ ভরা উজ্জ্বল তারকারাজির প্রদীপ মেলা। ভাষণটি বর্ণনা করেছেন প্রিয় রসূল সা.-এর এক জ্ঞানপিপাসু যুবক সাথি মুয়ায বিন জাবাল রা.। তিনি বলেন আল্লাহর রসূল সা. বলেছেনঃ

"তোমরা জ্ঞানার্জন করো, কারণ :[৫]

০১. জ্ঞানার্জন দ্বারা অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়।

০২. জ্ঞানান্বেষণ একটি ইবাদত।

০৩. জ্ঞানচর্চা একটি তসবীহ।

০৪. জ্ঞান গবেষণা একটি জিহাদ।

০৫. যার যে জ্ঞান নেই তাকে তা শিক্ষা দেয়া একটি দান।

০৬. উপযুক্তকে জ্ঞানদান করা একটি আত্মীয়তা। তাছাড়া

০৭. জ্ঞান হালাল-হারামের নির্ণায়ক।

০৮. জ্ঞান জান্নাত-প্রত্যাশীদের পথের প্রদীপ।

০৯. জ্ঞান নির্জনে বন্ধু।

১০. জ্ঞান পথ চলার সাথি।

১১. জ্ঞান একাকিত্বে আলোচক।

১২. জ্ঞান সুসময় ও দুঃসময়ের পথপ্রদর্শক।

১৩. জ্ঞান শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র।

১৪. জ্ঞান বন্ধু মহলে অলংকার।

১৫. জ্ঞানীদের আল্লাহ মর্যাদা দান করেন।

১৬. জ্ঞানীরা কল্যাণের কাজে নেতৃত্ব দেয়।

১৭. জ্ঞানীদের কর্ম অনুসরণ করা হয়।

১৮. জ্ঞানীদের মতামত মেনে নেয়া হয়।

১৯. ফেরেশতারা জ্ঞানীদের বন্ধুতার প্রত্যাশী হয়।

২০. ফেরেশতারা জ্ঞানীদের শরীরে ডানার পরশ বুলিয়ে দেয়।

---

৫. প্রতিটি কারণ অত্যন্ত গুরুত্ব বিধায় আমরা নম্বর দিয়ে সেগুলো সাজিয়ে দিয়েছি।

২১. জ্ঞানীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে সকল তাজা এবং নিরস বস্তু, পানির মাছ, স্থলের হিংস্র জানোয়ার আর নিরীহ পশু-পাখি।

২২. জ্ঞান হৃদয়কে অজ্ঞতার মৃত্যু থেকে জীবন্ত করে তোলে।

২৩. জ্ঞান অন্ধকারে দৃষ্টির আলো।

২৪. জ্ঞান ব্যক্তিকে ইহকাল-পরকালে মহত ব্যক্তিদের মর্যাদায় সমাসীন করে।

২৫. জ্ঞান নিয়ে ভাবনা সাওমের সমতুল্য।

২৬. জ্ঞান বিনিময় সালাতের সমতুল্য।

২৭. জ্ঞান আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করে।

২৮. জ্ঞান চিনিয়ে দেয় বৈধ আর অবৈধ।

২৯. জ্ঞান কর্মের পথ প্রদর্শক।

৩০. কর্ম জ্ঞানের অনুগামী।

৩১. সৌভাগ্যবানেরাই জ্ঞানার্জন করে।

৩২. জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় দুর্ভাগারাই।" [৬]

* * *

---

৬. সূত্র : ইবনে আবদুল বার আন নামেরি। তিনি বলেছেন, এটি একটি হাসান (উত্তম) হাদিস।

৫

আদর্শ প্রতিষ্ঠায় রসূলুল্লাহ সা.-এর দুর্জয় অংগীকার

রসূলুল্লাহ সা. ইসলাম তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে তাঁর জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। এই জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি এক সর্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। মহোত্তম দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে তিনি একদল প্রাণোৎসর্গী সাথি ও সহকর্মী সংগ্রহ করেন। ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর যমীনে তা বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্যে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সাথিরা গ্রহণ করেন দৃপ্ত শপথ আর অজেয় অংগীকার।

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার জন্যে রসূলুল্লাহ সা. এক সর্বব্যাপী আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন। এ কাজে তিনি এবং তাঁর সাথি সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকল ক্ষেত্রে ত্যাগ ও কুরবানীর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আমরা এখানে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর সেইসব অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর একটি ক্ষুদ্র ছবি আঁকতে চাই।

১. ভীমরুলের চাকে আদর্শিক দাওয়াতের ঢিল

ইবনে জরির তাবারি হারিস বিন আল হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সা. সমবেত লোকদের তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি তাদের বলছেন : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) –একথা স্বীকার করো, সাফল্য লাভ করবে।”

আমরা দেখলাম, তিনি একথাগুলো বলছেন আর উপস্থিত লোকগুলো তাঁকে নানাভাবে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। কেউ তাঁর প্রতি থুথু নিক্ষেপ করছে। কেউবা মুষ্টিভরে ধূলোবালি ছুঁড়ে মারছে। কেউবা গালি দিচ্ছে। তারা অনবরত এমনটি করতে থাকলো। এরি মধ্যে সূর্য মাথার উপর উঠে এলে তারা সবাই চলে গেলো। তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন হয়ে সেখানে পড়ে রইলেন।

এসময় একটি বালিকা ছুটে এলো তাঁর কাছে। মেয়েটির সম্মুখভাগের গলা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। ওর হাতে ছিলো একটি পানির পাত্র আর একটি রুমাল। রসূলুল্লাহ সা. পানি পান করলেন। তারপর অযু করলেন। তিনি

মেয়েটিকে বললেন : মা গলা ঢেকে নাও। আমরা লোকদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারলাম, মেয়েটি তাঁরই কন্যা যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা।

২. ঘরের শত্রু বিভীষণ

ইবনে আবি শাইবা, হাকিম, ইবনে হিব্বান, তাবরানি এবং ইমাম নাসায়ী তারিক বিন আবদুল্লাহ আল মুহাবেরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি একবার (মক্কার) যুল মাজায বাজারে গিয়ে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সা. উচ্চস্বরে জনতাকে বলছেন, "হে লোকেরা! বলো : 'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই'– তোমরা সাফল্য লাভ করবে।" দেখলাম এক ব্যক্তি তাঁর পিছে পিছেই লেগেছিল। সে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করছিল। এতে রসূলুল্লাহ সা. এর পদদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর পিছু নেয়া লোকটি তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে করতে লোকদের বলছিল, 'তোমরা এর কথা শুনো না, এ মিথ্যাবাদী।'

বর্ণনাকারী তারিক বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, পিছু নেয়া এই লোকটি কে? লোকেরা বললো, এ ব্যক্তি তাঁরই চাচা আবু লাহাব।

মুসনাদে আহমদ, ইবনে জরির তাবারি, ইবনে হিশাম, তাবরানি প্রমুখ রবীয়া বিন আব্বাদ আদ্দালীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একবার ছোট বেলায় আমি আমার পিতার সাথে বাজারে গিয়ে দেখি রসূলুল্লাহ সা. সমবেত কিছু লোকের কাছে বলছেন : 'হে বনি অমুক! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। তোমরা কেবল এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো। তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না। তোমরা আমাকে আল্লাহর রসূল হিসেবে সত্য বলে মানো এবং আমার সহযোগিতা করো, যাতে করে আমি যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছি তা সম্পন্ন করতে পারি।'

দেখলাম একটি লোক তাঁর পিছেই লেগেছিল। সে লোকদের বলছিল, হে বনি অমুক! তোমরা এর কথা শুনো না। এ তোমাদেরকে লাত ও উয্যা থেকে ফিরিয়ে নতুন ধর্মের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তোমরা ওকে মেনো না।

আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা! এই পিছু নেয়া লোকটি কে? তিনি বললেন, এই ব্যক্তি তাঁরই চাচা আবু লাহাব।

৩. প্রতিবেশীদের ঘৃণ্য আচরণ

ইবনে জরির তাবারি, বালাযুরি, ইবনে হিশাম, ইবনে আবি হাতিম, বায়হাকি ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, মক্কায় রসূলুল্লাহ সা. এর নিকটতম প্রতিবেশী ছিলো আবু লাহাব। তাছাড়া হাকাম (মারওয়ানের পিতা), উকবা বিন আবু মুয়ীত, সাদী সাকাফী প্রমুখও তাঁর প্রতিবেশী ছিলো। এরা রসূলুল্লাহ সা.-কে সীমাহীন জ্বালাতন করতো। নবী হবার পর তারা তাঁকে একদিনের জন্যেও নিজ বাড়িতে শান্তিতে বাস করতে দেয়নি।

কখনো তিনি নামায পড়তেন, আর তারা তাঁর উপর ছাগল-ভেড়ার নাড়ীভূড়ি নিক্ষেপ করতো।

কখনো উনুনে রান্না করা হতো আর এরা পাতিলে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। রসূল সা. বেরিয়ে এসে শুধু এতোটুকু বলতেন হে বনি আবদে মানাফ! এ কোন্ ধরনের আচরণ?

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল প্রতি রাত্রে রসূলুল্লাহ সা. এর ঘরের দরজায় কাঁটাদার ডাল-শাখা ফেলে রাখতো, যাতে করে ভোরে নবী করিম সা. ঘরের বাইরে বেরুতেই তিনি কাটাবিদ্ধ হন। এ মহিলা নিয়মিত এই অসদাচরণ করতো। অথচ নবী করিম সা. সব সময়ই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন।

৪. শয়তানের নোংরা অট্টহাসি

সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. একদিন কা'বার হেরেমে নামায পড়ছিলেন। সেখানে অনতিদূরেই কুরাইশ নেতারা বসে গল্প-গুজব করছিল। আবু জাহেল বললো : মুহাম্মদ সাজদায় গেলে কেউ যদি উটের নাড়ীভূড়ি এনে তার ঘাড়ের উপরে ফেলে চাপা দিয়ে রাখতো, তবে কী মজাই না হতো।' -একথা শুনে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত বললো : এ কাজ আমি করতে পারবো।

অতপর উকবা দৌড়ে গিয়ে উটের নাড়ীভূড়ি এনে সাজদারত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সা.-এর ঘাড়ের উপর ফেলে রাখলো। তিনি মাথা উঠাতে পারছিলেন না। পাষণ্ডগুলো এ অবস্থা দেখে অট্টহাসিতে আত্মহারা হয়ে উঠে।

খবর শুনে রসূলুল্লাহ সা.-এর শিশু কন্যা ফাতিমা দৌড়ে এলেন। বহু কষ্টে পিতার ঘাড়ের উপর থেকে নাড়ীভূড়ি সরিয়ে দিলেন। এ সময় শিশু ফাতিমা উকবাকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন।

৫. গলায় চাদর পেঁচিয়ে মারার চেষ্টা

ইমাম বুখারি, ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামসহ বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একদিন কুরাইশ সর্দাররা কা'বার চত্বরে বসা ছিলো। এমনি সময় রসূলে আকরাম সা. হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন। তারা তাঁকে দেখতেই তাঁর উপর হিংস্র পশুদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তখনকার কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রা. বলেন, আমি দেখলাম, তাদের একজন (অর্থাৎ- উকবা ইবনে আবু মুয়ীত) রসূলুল্লাহ সা. কে তাঁর গলার উপরে ঝুলে থাকা চাদরের দু'পাশ ধরে টেনে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। ঠিক সে মুহূর্তে আবু বকর সেখানে দৌড়ে এলেন। তিনি উকবাকে প্রতিহত করলেন এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর গলায় ফাঁস খুলতে খুলতে বললেন : "আল্লাহ আমার প্রভু -একথাটি বলার কারণে কি তোমরা একজন লোককে হত্যা করবে?"

আবদুল্লাহ বলেন, তখন পাষণ্ডরা সেখান থেকে চলে গেলো। তিনি আরো বলেন, সেদিন আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর উপর কুরাইশদের যে রকম মারাত্মক আক্রমণ দেখেছি, সেরকম আর কখনো দেখিনি।

৬. ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দিলেও নয়

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশামসহ বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাঁর কাজে সহযোগিতা করে আসছিলেন। কুরাইশদের আক্রমণ থেকে তিনি তাঁকে রক্ষা করতেন এবং তাঁর পাশে দাঁড়াতেন। কুরাইশরা এসে আবু তালিবের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো এবং তাঁর কঠোর সমালোচনা করে তাঁর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার অনুরোধ করতো।

কিন্তু আবু তালিব তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে বিদায় দিতেন। এদিকে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতেন। ফলে কুরাইশদের বিদ্বেষ ও আক্রোশ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। অবশেষে তারা রসূল সা. কে হত্যা করতেও উদ্যত হয়।

কুরাইশরা আবারো আবু তালিবের কাছে উপস্থিত হয়। তারা তাকে বলে : হে আবু তালিব! আপনি আমাদের প্রধান ও মুরব্বী। আমরা আপনাকে নেতা ও

শ্রদ্ধেয় মনে করি। আমরা অনুরোধ করেছিলাম আপনি আপনার ভাতিজাকে তার কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু আপনি তা করলেন না।

তারা আরো বলে, আল্লাহর কসম, আমরা এভাবে চলতে দিতে পারি না। সে আমাদের ধর্ম, দেবদেবী ও পূর্ব পুরুষদের সমালোচনা করে। সে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে বোকামি ও অজ্ঞতা ঠাওরাচ্ছে।

তার ধৃষ্টতা এখন আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন হয় আপনি তাকে তার কাজ থেকে বিরত রাখুন। নতুবা আমরা আপনার ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। এ যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যাবো যতোক্ষণ না এক পক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়।

আবু তালিব রসূলুল্লাহ সা.-কে ডেকে পাঠান। তিনি এলে আবু তালিব বললেন : ভাতিজা! তোমার কওমের লোকেরা আমার কাছে এই এই কথা বলেছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যা যা বলেছিল, তিনি সবই তাঁকে খুলে বলার পর বললেন : অবস্থা যখন এতোটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন তুমি নিজেকে এবং আমাকে সামাল দিয়ে চলো। আমার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু আমার উপর চাপিয়ে দিও না।

চাচার কথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. ভাবলেন, কুরাইশ নেতারা হয়তো চাচার মতও পাল্টে দিয়ে গেছে। তিনি এখন হয়তো কুরাইশদের মুকাবিলায় তাঁকে একা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন এবং তাকে সহযোগিতা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তাই বিশ্বনেতা সা. দৃপ্ত কণ্ঠে চাচাকে বলে দিলেন :

"চাচা, আল্লাহর কসম! এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় এবং তার বিনিময়ে আমাকে একাজ থেকে বিরত থাকতে বলে, তবু আমি একাজ ত্যাগ করবো না, যতোদিন না আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করেন, কিংবা এ কাজ করতে করতে আমার মৃত্যু হয়।

এই কথাগুলো বলতে বলতে রসূলুল্লাহ সা.-এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তাঁর দু'গণ্ড বেয়ে। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং নীরবে ফিরে চলেন।

কয়েক কদম যেতে না যেতেই আবু তালিব তাঁকে ডেকে কাছে আনলেন। বললেন : ভাতিজা! ঠিক আছে তুমি যে কাজ করছো, করে যাও। আমি কিছুতেই তোমাকে ওদের হাতে সমর্পণ করবো না।

৭. কোনো কিছুর বিনিময়েই আদর্শ ত্যাগ করা যায় না

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, একবার কুরাইশদের প্রখ্যাত নেতা উতবা ইবনে রবীয়া রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে তাঁর পাশে বসলো। সে পাশে বসে অত্যন্ত সুকৌশলে মন ভোলানো ভাষায় রসূল সা.কে বললো : তুমি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কতো বড় সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান, তাতো তুমিই জানো।

তুমি একটা মারাত্মক জিনিস নিয়ে আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছো। তুমি আমাদের সবাইকে বেওকুফ ঠাওরিয়েছো। আমাদের পূর্ব পুরুষদের হেয় করেছো। তবে এখন আমার কথা শুনো। আমি তোমার কাছে কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ভেবে দেখো, এখান থেকে কোনো না কোনো প্রস্তাব মেনে নিতে পারো কিনা?

রসূলুল্লাহ সা. বললেন : বেশ বলুন, আমি শুনছি। উতবা বললো : ভাতিজা! তুমি যে নতুন জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছো, তার উদ্দেশ্য যদি হয় বিপুল অর্থসম্পদ লাভ করা, তবে আমরা অর্থ সংগ্রহ করে তোমাকে আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় সম্পদশালী বানিয়ে দেবো এবং এর বিনিময়ে তুমি তোমার এ কাজ ত্যাগ করো।

কিংবা তোমার এ কাজের উদ্দেশ্য যদি হয় নেতা হওয়া, তবে একাজ ত্যাগ করো, আমরা সবাই মিলে তোমাকে আমাদের নেতা হিসেবে স্বীকার করে নেবো এবং তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবো না।

আর যদি ব্যাপারটা এমন হয়ে থাকে যে, তোমাকে জ্বিনে পেয়েছে এবং তুমি সে জ্বিন তাড়াতে পারছো না, তবে আমরা তোমার চিকিৎসা করবো। যতো অর্থকড়িই খরচ হোক, আমরা তা করবো এবং তোমাকে সুস্থ করে তুলবো। কেননা অনেক জ্বিন এমন হয়ে থাকে, যারা মানুষকে প্রবলভাবে পেয়ে বসে। সে জ্বিন তাড়াবার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

-এ পর্যন্ত বলার পর উতবা থামলো।

রসূলুল্লাহ সা. মনোযোগ দিয়ে নিরবে তার কথা শুনছিলেন। সে থামলে রসূলুল্লাহ সা. বললেন, হে অলীদের পিতা! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বললো, হ্যাঁ।

রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তবে এবার আমার কিছু কথা শুনুন। উতবা বললো, হ্যাঁ, তোমার কথা বলো।

রসূলুল্লাহ সা. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে সূরা হামীম আস্ সাজদা থেকে তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন : "হামীম। এটি রহমানুর রহীমের নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব। এ কিতাবের আয়াতসমূহ একেবারেই স্পষ্ট-পরিষ্কার। (তোমাদেরই মাতৃভাষা) আরবির ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এ কুরআন। যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে, তাদের জন্যে এ কিতাব সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা শুনতে পায় না।...

তিলাওয়াত করতে করতে সাজদার আয়াত এলে তিনি সাজদা করলেন। উতবা দুই হাত পিছনের দিকে মাটিতে ঠেস দিয়ে মনোযোগের সাথে শুনছিল। রসূলুল্লাহ সা. সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে তাকে বললেন : হে অলীদের পিতা! আমার জবাব নিশ্চয়ই আপনি পেয়ে গেছেন। এখন যা ইচ্ছে করতে পারেন।

উতবা উঠে কুরাইশদের আসরের দিকে অগ্রসর হলো। তারা দূর থেকেই উতবাকে দেখে বললো, আল্লাহর কসম উতবার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। অতপর সে এসে বসলে তারা জিজ্ঞেস করলো, কী শুনে এলে?

উতবা বললো, আল্লাহর কসম, আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম এটা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষীর কথাও নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বাণী সফল হবেই। তোমরা ওর ব্যাপারটা ওর উপর ছেড়ে দাও। সে যা করতে চায় করতে দাও।

আরবরা যদি তার উপর বিজয়ী হয়, তবে তোমরা নিজেদের ভাইয়ের উপর হাত উঠানো থেকে বেঁচে গেলে। আর যদি সে বিজয়ী হয় তবে তার রাজত্ব তো তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার সম্মান-মর্যাদাতো তোমাদেরই সম্মান মর্যাদা।

৮. আদর্শ প্রতিষ্ঠার দুর্জয় অংগীকার

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন। হাজারো অত্যাচার নির্যাতনের পরও যখন পুরুষ ও নারীদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটতে লাগলো, তখন

ইসলামের প্রতিপক্ষ দিশেহারা হয়ে উঠলো। এমনি পরিস্থিতিতে এক সন্ধ্যায় কুরাইশের সব শাখার সর্দাররা কা'বার চত্বরে এসে সমবেত হয়।

সেখানে উপস্থিত কুরাইশ সর্দাররা ছিলো : উতবা, শাইবা, আবু সুফিয়ান, নাদার, আবুল বুখতরী, আসওয়াদ, আ'স বিন ওয়াইল, নুবাহ, মুনাব্বিহ এবং উমাইয়া বিন খালফ। এই সর্দাররা পরামর্শ করে ঠিক করলো, মুহাম্মদকে এখানে ডেকে এনে তার সাথে কথা বলা হবে, ঝগড়া করা হবে এবং তার কাছে অসম্ভব দাবি দাওয়া পেশ করা হবে। তারা বললো, এমনটি করা হলে জনগণ মুহাম্মদেরই দোষ দেবে এবং আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে।

ফয়সালা অনুযায়ী নবী করিম সা.-কে ডেকে আনার জন্যে একজনকে পাঠানো হলো। সেই দূত গিয়ে তাঁকে বললো : কুরাইশ সরদারগণ কা'বার চত্বরে সমবেত হয়েছেন। তারা আপনার সাথে কথা বলতে চান। আমার সাথে তাদের কাছে চলুন।

একথা শুনা মাত্র রসূলুল্লাহ সা. তাদের দিকে ছুটে চললেন। তিনি ভাবলেন, তিনি তাদেরকে যে মহান আদর্শের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, তারা হয়তো সে ব্যাপারে পজেটিভ চিন্তা ভাবনা করছে। তাদের গোঁয়ার্তুমি এবং অত্যাচার নির্যাতনে যদিও তিনি খুবই ব্যথিত ছিলেন, কিন্তু তিনি সব সময়ই আন্তরিকভাবে কামনা করতেন, তারা সঠিক পথে আসুক। এখন সেই আশা নিয়েই তাদের আহ্বানে ছুটে চললেন। তিনি তো জানতেন না তারা কি ষড়যন্ত্র এঁটে তাঁকে কা'বার চত্বরে ডেকে পাঠিয়েছে।

অবশেষে তিনি তাদের কাছে পৌঁছুলেন, তাদের পাশে গিয়ে বসলেন। তারা বললো : হে মুহাম্মদ! কিছু জরুরি কথা বলার জন্য আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। শুনো! আল্লাহর কসম! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো। তুমি এমন কাজ করছো, যা আর কোনো আরব করেনি। তুমি আমাদের বাপদাদার ধর্মের সমালোচনা করছো, আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করছো, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা বানাচ্ছো এবং আমাদের জাতির ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছো। এখন কথা হলো, আমাদের খুলে বলো, এসব কথাবার্তা ও কাজকর্মের পিছনে তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কী?

এর দ্বারা যদি তুমি অর্থসম্পদ অর্জন করতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে এতো অর্থকড়ি সংগ্রহ করে দেবো যে তুমি আমাদের মধ্যে সবচে' বড় বিত্তশালী হবে। আর একাজের মাধ্যমে যদি তুমি সরদার হতে চাও, তবে

আমরা সবাই মিলে তোমাকে আমাদের সরদার বানিয়ে দেবো। কিংবা তুমি যদি রাজত্ব চাও, তাতেও আমরা রাজি। আমরা সবাই মিলে তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে নেবো। আর যদি ব্যাপার এমন হয়ে থাকে যে, তোমার কাছে যে দূত আসে, সে খুব প্রতাপশালী জ্বিন-ভূত, তাও বলো, যতো অর্থ লাগুক আমরা তোমাকে চিকিৎসা করাবো এবং সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবো, যেনো তোমার ব্যাপারে জনগণের কাছে আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে না হয়।

তাদের বক্তব্য শুনার পর বিশ্ব মানবতার নেতা অত্যন্ত শান্ত ধীরে জবাব দিলেন :

"তোমরা যা কিছু আমাকে অফার দিলে এর কোনো কিছুই আমি চাই না। আমি যে মহান আদর্শের দিকে তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে অর্থ সম্পদ, কিংবা নেতৃত্ব চাই, অথবা রাজা-বাদশা হতে চাই। এগুলোর কিছুই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাকে মহান আল্লাহ তাঁর রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি আমার প্রতি তাঁর বাণী (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। এতে তিনি আমাকে মানুষের জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমি তোমাদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি, তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি। এখন তোমরা যদি আমার এই দাওয়াত গ্রহণ করে নাও, তবে সেটা তোমাদেরই ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনবে। আর যদি তোমরা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করো, তবে তোমাদের ও আমার মাঝে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত আমি দৃঢ়তার সাথে আমার কাজে অটল থাকবো এবং তোমাদের সব আচরণ সয়ে যাবো।"

এরপর তারা রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে একে একে কতগুলো অলৌকিক ও অবান্তর দাবি-দাওয়া পেশ করে।

এর জবাবে তিনি তাদের বলেন : আমি এসব ব্যাপার নিয়ে তোমাদের কাছে আসিনি। এগুলো সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এ আহ্বান গ্রহণ করলেই তোমাদের সমস্ত সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা.-কে কোনো প্রকারেই তাঁর মহান মিশন থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে কুরাইশরা তাকে এবং তার গোত্রকে

বয়কট করে। নিরুপায় হয়ে তারা তিন বছর পাহাড়ের পাদদেশে শিবে আবি তালিবে অন্তরীণ হয়ে থাকে।

বয়কটের কারণে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে না পারায় তিন বছর পর্যন্ত তাঁরা সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। কিন্তু রসূল সা. তাঁর নীতি ও আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। বরং আরো অধিক ধৈর্য ও অটলতা প্রদর্শন করেন। এছাড়া তায়েফের ঘটনা তো পাঠকদের অজানা নয়।

হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে আরো ভুরি ভুরি বিবরণ রয়েছে। সব ঘটনা এখানে উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু আমরা এতোটুকুই বলতে চাই, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. যে ধরনের অটল অবিচল অংগীকার নিয়ে কাজ করেছিলেন, যেমনি করে সমস্ত অবজ্ঞা, তিরস্কার, উপহাস, উপদ্রব, বাধা বিপত্তি, অত্যাচার নির্যাতন, হয়রানি, দুঃখ কষ্ট সয়ে সয়ে দুঃসাহসী সৈনিকের মতো সাহস আর পাহাড়ের মতো অটল অবিচল ধৈর্যের সাথে জগদ্দলময় পথ অতিক্রম করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, আজো কেবল তাঁর সেই সোনালি পদাংক অনুসরণের মাধ্যমেই আধুনিক বিশ্বে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা সম্ভব। কেবল সে পন্থায়ই আসতে পারে মানবতার মুক্তি এবং প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বিশ্বশান্তি।

* * *

৬

শ্রেষ্ঠ নেতার মহোত্তম গুণাবলী

রসূলুল্লাহ সা. ইসলামি নেতৃত্বের মডেল। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতো উত্তম কথা বলেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا •

"তোমাদের সেইসব লোকদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে অনুসরণীয় আদর্শ, যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা পোষণ করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।" (সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত ২১)

তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর রসূলকে অনুসরণ করা মুমিনদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। দীন ও শরীয়তের সকল বিষয়ে রসূলুল্লাহ সা. এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র গঠনেও মুমিনদের তাঁকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁরই আনুগত্য ও তাঁকেই অনুসরণ-অনুবর্তন করতে হবে। এই সহজ সরল কথাটি মুমিনদের জানিয়ে দেয়ার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ • قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"(হে নবী, তাদের) বলো : তোমরা যদি সত্যি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল-দয়াময়। তুমি তাদের বলো : তোমরা আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করো। তারা যদি একথা অমান্য করে তবে আল্লাহ এসব কাফিরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩১-৩২)

এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মুমিনদের অবশ্যি আল্লাহর রসূল সা. -কে সকল কাজে আদর্শ ও নমুনা হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁরই আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে।

এখানে আমরা চাই, হাদিস ও সীরাত গ্রন্থাবলীর আলোকে বিশ্বনবী বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবন-বৈশিষ্ট্য ও মহত গুণাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত ছবি আঁকতে। যাতে করে এ ছবি দেখে তাঁর অনুসারী নেতৃবৃন্দ তাঁরই মতো মহত গুণাবলী অর্জনের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

১. কারো সাথে সাক্ষাত হলেই সালাম দিতেন

বিশ্বনেতা রসূলুল্লাহ সা. নারী-পুরুষ-শিশু যার সাথেই সাক্ষাত হতো, তাকেই সালাম দিতেন। নিজেই আগে সালাম দিতেন। অথবা কেউ তাঁকে সালাম দিলে উত্তমভাবে তার জবাব দিতেন।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. বলেন, এক স্থানে আমরা কিছুসংখ্যক মহিলা বসা ছিলাম। তখন আমাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রমকালে রসূলুল্লাহ সা. আমাদের সালাম দেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি)।

আনাস রা. বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সা. একদল বালকের নিকট দিয়ে যাবার সময় তাদের সালাম দেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

প্রিয় নবী সা. অন্যদের তো আগে সালাম দেবার চেষ্টা করতেনই, কিশোর এবং মহিলাদেরকেও আগে সালাম দেবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেছেন, আগে সালাম দানকারী আল্লাহর অধিক নিকটে এবং অহংকারমুক্ত।

২. হাসিমুখে কথা বলতেন

জরির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রসূলুল্লাহ সা. আমাকে কখনো তাঁর নিকট যেতে বাধা দেননি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, স্মিত (মিষ্টি) হেসেছেন। (মু'আত্তায়ে মালেক)।

৩. তিনি সাথিদের সাথে মুসাফাহা মু'আনাকা করতেন

হাতে হাত মিলিয়ে সম্ভাষণ জানানোকে মুসাফাহা এবং গলায় গলা মিলিয়ে গলাগলি করে সম্ভাষণ জানানোকে মু'আনাকা বলা হয়। রসূলে করিম সা. তাঁর সহকর্মীগণকে এসব পদ্ধতিতে সম্ভাষণ জানাতেন।

আবু আইউব বুশাইর বলেন, এক ব্যক্তি আবু যর রা. কে জিজ্ঞাসা করেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন আপনাদের (সাহাবিদের) সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন কি তিনি মুসাফাহা করতেন? আবু যর বলেন, আমি যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি, তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করেছেন। একবার তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি ঘরে ছিলাম না। পরে ঘরে এসে সংবাদটি পাওয়ার সাথে সাথে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলাম।

তখন তিনি খাটের উপর বসা ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন : তাতে কী যে আনন্দ পেয়েছি! কী যে খুশি অনুভব করেছি! (আবু দাউদ)।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, একবার যায়েদ বিন হারিসা (এক অভিযান শেষে) মদিনায় ফিরে এলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ সা. আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ এসে দরজায় টোকা দিতেই তিনি খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তার দিকে ছুটে গেলেন।... অতপর তার সাথে গলাগলি করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন। (তিরমিযি)।

জা'ফর ইবনে আবু তালিব রা. বলেন, আমরা হাবশা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে অবশেষে মদিনা এসে পৌঁছলাম। তখন রসূলুল্লাহ সা. আমার সাথে সাক্ষাত করতে এলেন এবং আমার সাথে মু'আনাকা (গলাগলি) করলেন। এ সময় তিনি আমাকে বললেন : 'বুঝতে পারছি না, খায়বর বিজয় আমাকে বেশি আনন্দ দিচ্ছে, নাকি জা'ফরের আগমন!' ঘটনাচক্রে খায়বর বিজয় এবং জা'ফরের প্রত্যাবর্তন একই সময় ঘটেছিল। (মিশকাত)।

৪. তিনি ছিলেন সর্বাধিক দাতা ও সর্বাধিক সাহসী

আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন মানুষের মধ্যে সুন্দরতম এবং সবচে' বড় দাতা এবং সর্বাধিক সাহসী বীর। এক রাত্রে লোকেরা (শহরতলীর দিকে শোরগোল শুনে ভাবলো ইহুদিরা আক্রমণ করেছে, তাই) ভয় পেয়ে গেলো।

অতপর (রণপ্রস্তুতি নিয়ে) সবাই শোরগোলের দিকে যাত্রা শুরু করলো। কিছু দূর গিয়ে লোকেরা দেখলো নবী করিম সা. শোরগোলের দিক থেকে ফিরে আসছেন। তিনি সবার আগে শোরগোলের স্থানে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর লোকদের সাথে দেখা হয়। তিনি তাদের বললেন : কিছুনা, ভয় পেয়ো না, ভয়ের কারণ নেই।' (সহীহ বুখারি)।

জাবির রা. বলেন, এমন কখনো হয়নি যে, কেউ রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে কিছু চেয়েছে আর তিনি বলেছেন : 'না'। (বুখারি ও মুসলিম)।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক অভাবী ব্যক্তি এসে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট কিছু চাইলো। তিনি তাকে বললেন, এ মুহূর্তে তো আমার কাছে কোনো অর্থ কড়ি নেই। তুমি আমার নামে বাকি কিনে নাও। উমর বলেন, একথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল!

আপনি কেন নিজের উপর এতো বোঝা চাপিয়ে নিচ্ছেন? উমর বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমার একথাগুলো পছন্দ করলেন না। তখন অন্য এক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি প্রচুর ব্যয় (দান) করুন। আরশের মালিকের কাছে আপনি স্বল্পতার আশংকা করবেন না।' একথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মুখ মণ্ডলে আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। (আখলাকুন নবী : আবু শায়খ ইসফাহানি)।

৫. তিনি সকলের আব্দার রক্ষা করতেন

আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন ফজরের সালাত পড়া শেষ করতেন, তখন মদিনার লোকদের চাকর-চাকরানীরা তাঁর কাছে পাত্র ভরা পানি নিয়ে উপস্থিত হতো (যেনো তিনি তাদের পানি স্পর্শ করে দেন)। তখন তিনি তাদের প্রত্যেকের পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে দিতেন। অনেক সময় তারা শীতের সকালেও আসতো। তখনো তিনি তাদের পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে দিতেন। (সহীহ মুসলিম)।

আনাস রা. বলেন, মদিনার একটি ছোট বালিকাও নবী করিম সা. কে হাতে ধরে (নিজের অভিযোগ শুনানোর জন্য) যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারতো। (বুখারি)।

৬. তিনি কখনো মানুষকে খারাপ কথা বলতেন না

আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. কখনো কাউকেও অশ্লীল-অশালীন কথা বলতেন না, অভিশাপ দিতেন না এবং গালাগাল করতেন না। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে শুধু এতোটুকু বলতেন : তার কি হলো, তার কপাল ধুলোমলিন হোক! (সহীহ বুখারি)।

৭. তিনি ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল

আবু সায়ীদ খুদরি রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন পর্দানশীল কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল। তিনি যখন কিছু অপছন্দ করতেন, তখন আমরা তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তা বুঝতে পারতাম। (বুখারি ও মুসলিম)।

সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন অত্যধিক লজ্জাশীল। যখনই তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হতো, তিনি দিয়ে দিতেন। (আখলাকুন নবী)।

৮. তিনি কথার খই ফুটাতেন না

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, তোমরা যেমন কথার খই ফুটাও, রসূলুল্লাহ সা. সেরকম অনবরত কথা বলতেন না। বরং তিনি যখন কথা বলতেন, তখন

তিনি এমনভাবে শান্তভাবে ধীরে থেমে থেমে কথা বলতেন, যে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর কথাগুলো গুণে রাখতে পারতো। (বুখারি ও মুসলিম)।

জাবির রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে কথা বলতেন এবং তিনি প্রতিটি কথাকে আলাদা ও স্বতন্ত্র করে উচ্চারণ করতেন। (আবু দাউদ)।

৯. তিনি অধিক সময় নীরব থাকতেন

রসূলুল্লাহ সা. কখনো বাজে এবং অনর্থক কথা বলতেন না। প্রয়োজনীয় কথা বলতেন, অর্থবহ কথা বলতেন এবং কম কথা বলতেন। দীর্ঘ সময় কথা না বলে নিরব থাকতেন। জাবির ইবনে সামুরা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. দীর্ঘ সময় ধরে নিরব থাকতেন। (মিশকাত)।

১০. সাহায্যকারী ও সহকর্মীদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করতেন

আনাস রা. বলেন, আমি আট বছর বয়সে রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসেছি এবং দশ বছর কাল তাঁর খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে তিরস্কার করেননি। আমার কোনো কাজে কখনো 'উহ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। এমনকি 'এটা করলে কেন?', 'ওটা করলে না কেন?'-এরকম কথাও কখনোই আমাকে বলেননি। আমার হাতে কখনো কিছু নষ্ট হবার কারণে কেউ আমাকে তিরস্কার করলে তিনি বলতেন, যা হবার হয়ে গেছে, ওকে ছেড়ে দাও। (বুখারি, মুসলিম)।

১১. তিনি নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ নিতেন না

রসূলুল্লাহ সা. কখনো নিজের ব্যাপারে কারো উপর প্রতিশোধ নিতেন না। তবে কারো দাবি থাকলে নিজের উপর প্রতিশোধ নিতে দিতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদরত অবস্থা ছাড়া কখনো কাউকেই নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের ব্যাপারে কখনো কারো উপর প্রতিশোধ নেননি। (বুখারি ও মুসলিম)।

১২. সব সময় সহজ কাজটি করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা.-কে যখন দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার অবকাশ দেয়া হতো, তখন তিনি অবশ্যি উভয়টির মধ্যে সহজটি গ্রহণ করতেন। কিন্তু সেটি যদি গুণাহের কাজ হতো, তবে তিনি সেটি থেকে সকলের চেয়ে দূরে থাকতেন। তাঁর এ নীতির ব্যতিক্রম কখনো হয়নি। (বুখারি ও মুসলিম)।

প্রিয় নবী সা. তাঁর সাথিদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা সব সময় মানুষকে সুসংবাদ দেবে, নিরাশ করবে না। সহজতা বিধানের নীতি অবলম্বন করবে, কাঠিন্য আরোপ করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)।

১৩. তিনি ছিলেন সরল জীবনের অধিকারী

আনাস রা. বলেছেন. রসূলুল্লাহ সা. রোগীর সেবা করতেন, কফিনের সাথে যেতেন, সেবক কর্মচারীদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং গাধার পিঠে চড়তেন। (ইবনে মাজাহ)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. নিজেই নিজের জুতা মেরামত করতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন এবং তোমাদের মতোই ঘরের কাজকর্ম করতেন। তিনি অন্যসব মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড় চোপড় থেকে পোকা বাছতেন, নিজ বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন। (তিরমিযি)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. অভাবী, গরীব ও দরিদ্রের সাথে চলাফেরা করতে কোনো প্রকার সংকোচ বোধ করতেন না। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং বিধবাদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন। (নাসায়ী ও দারেমি)।

১৪. তিনি ছিলেন পরম সৌজন্য বোধের অধিকারী

আনাস রা. বলেন রসূলুল্লাহ সা. যখন কারো সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন তিনি নিজের হাত ততোক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িয়ে নিতেন না যতোক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজের হাত সরিয়ে নিতো। তিনি ততোক্ষণ পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরাতেন না, যতোক্ষণ না সে নিজে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতো। তাঁকে কখনো মানুষের দিকে পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি। (তিরমিযি)।

১৫. তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন

আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ করতেন। কদাচিত অর্থহীন কথা বলতেন। তিনি নামায দীর্ঘ করতেন, ভাষণ সংক্ষেপ করতেন। (নাসায়ী ও দারেমি)।

১৬. সাথি সহকর্মীদের প্রতি ছিলো তাঁর অগাধ দরদ

জরির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরটি লোকে ভর্তি হয়ে গেলো। আমি পরে এসে ঘরে

জায়গা না পেয়ে বাইরে বসে পড়লাম। ভিতর থেকে নবী করিম সা. আমাকে বাইরে বসতে দেখে নিজের চাদর ভাঁজ করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, 'এটি বিছিয়ে বসো।' জরির বলেন, আমি কাপড়টি তুলে নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে চেপে ধরলাম এবং তাতে চুমু খেলাম। (আখলাকুন নবী : আবু শাইখ ইসফাহানি)।

আনাস রা. বলেন, নবী করিম সা. যদি একাধারে তিনদিন কোনো দীনি ভাইকে না দেখতেন, তখন তার সম্পর্কে অন্যদের জিজ্ঞাসা করতেন। যদি জানতেন সে সফরে আছে, তখন তার জন্যে দু'আ করতেন। যদি জানতেন বাড়িতেই আছে, তবে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন। আর যদি জানতেন অসুস্থ হয়েছে, তবে সেবা শুশ্রূষা করতেন। (আখলাকুন নবী)।

১৭. তিনি সাথিদের সাথে হাসি খুশি থাকতেন

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জুযই রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর চেয়ে অধিক হাসি-খুশি মানুষ আর দেখিনি। (মিশকাত)।

উমরা বিনতে আবদুর রহমান রা. বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূলুল্লাহ সা. ঘরে কিভাবে সময় কাটাতেন? তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র, নম্র, চমৎকার এবং সবচেয়ে হাসিখুশি মানুষ। (আখলাকুন নবী)।

আবুদ দারদা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন কারো সাথে কোনো কথা বলতেন, তখন তার মুখে স্মিত হাসির আভা ফুটে উঠতো। (আখলাকুন নবী)।

১৮. তিনি কাউকেও অপমানিত করতেন না

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. কখনো কাউকেও অপমানিত করতেন না। কারো বিষয়ে কোনো অপছন্দনীয় কিছু অবগত হলে তিনি তাকে একথা বলতেন না যে, তুমি এটা কেন করেছো? বরং তিনি সাধারণভাবে সম্বোধন করে বলতেন : 'লোকদের কী হলো যে তারা এই কথা বলছে?' এতে করে সেই ব্যক্তি সকলের অগোচরেই সংশোধন হয়ে যেতো। (আখলাকুন নবী)।

১৯. তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবধর্মী

আবু হুরাইরা এবং আবু সায়ীদ খুদরি রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. একদিন আমাদের নিয়ে ফজর নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি শিশুর কান্না শুনে

নামায সংক্ষেপ করে ফেলেন। নামায শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রসূল! আজ আপনি নামায এতোটা সংক্ষেপ করলেন কেন? তিনি বললেন : আমি একটি শিশুর কান্না শুনে আশংকা করলাম (আমার সাথে জামাতে নামাযরতা) তার মার মন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে, (তাই নামায সংক্ষেপ করে দিয়েছি)। (আখলাকুন নবী)।

মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, বন্ধুসুলভ এবং সহানুভূতিশীল। আমরা আমাদের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদিনায় এসে তাঁর সান্নিধ্যে বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। তখন তিনি চিন্তা করলেন, আমাদের হয়তো বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি আমাদের ডাকলেন, আমরা বাড়িতে কাদের রেখে এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁকে বিস্তারিত জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখন তোমাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথেই অবস্থান করো। - আখলাকুন নবী।

২০. তিনি সুবাস পসন্দ করতেন

আনাস রা. বলেন, নবী করিম সা. যখন আমাদের কাছে আসতেন তখন তাঁর সুগন্ধির কারণে আমরা আগেই টের পেতাম, তিনি আসছেন। - আখলাকুন নবী

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. এর নিয়ম ছিলো, তিনি সুগন্ধ শরীর বা সুগন্ধ পরিধেয় ছাড়া সাথিদের সাথে সাক্ষাতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি শেষ রাতে সুগন্ধি মাখতেন।

আনাস রা. বলেন, নবী করিম সা. বিবিদের ঘরে গেলে সুগন্ধি খোঁজ করতেন। (আখলাকুন নবী)।

২১. তিনি পরামর্শ করে কাজ করতেন

রসূলুল্লাহ সা. শরীয়তের বিধান দেয়া ছাড়া বাকি অন্যান্য কাজ তাঁর সাথিদের সাথে পরামর্শ করে করতেন। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই তাকে পরামর্শ করে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নবী হিসেবে তিনি লোকদের উপর নিজের মত ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে পরামর্শ গ্রহণ করেই কাজ করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, নিজের লোকদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি রসূলুল্লাহ সা. এর চেয়ে অগ্রসর আর কোনো লোককে দেখিনি। (তিরমিযি)।

২২. তিনি দারিদ্র্য পছন্দ করতেন

বিভিন্ন সাহাবির সূত্রে বর্ণিত অনেকগুলো হাদিস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সা. নিজেই নিজের জন্য দারিদ্র্য বেছে নিয়েছেন। যখনই তাঁর হাতে অর্থকড়ি আসতো, তিনি সাথে সাথে সেগুলো বিলিয়ে দিতেন। তাঁর হাতে যতোক্ষণ কিছু না কিছু থাকতো, ততোক্ষণ তাঁর কাছে কিছু চেয়ে কেউ বিমুখ হতো না। অনেক সময় তিনি ধার করে দান করতেন। কেউ চাওয়ার পর কিছু না দিতে পারলে তিনি পেরেশান হয়ে যেতেন। অভাবের তাড়নায় প্রায় দিনই তিনি না খেয়ে থাকতেন। খুব কম সময়ই পেট ভরে খেতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি চাইলে আল্লাহ পাক তাঁকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সব সম্পদ প্রদান করতেন। কিন্তু তিনি দারিদ্র্যের পথই বেছে নিয়েছেন।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. বলেন, ওফাতের দিন রসূলুল্লাহ সা.-এর বর্মটি এক ওসাক যবের বিনিময়ে এক ইহুদির কাছে বন্ধক ছিলো।

আনাস রা. বলেন, একবার ফাতিমা রা. এক টুকরো যবের রুটি নিয়ে নবী করিম সা. এর ঘরে এলেন। তিনি ফাতিমা রা.-কে বললেন, তিন দিনের মধ্যে এটাই তোমার পিতার প্রথম আহার।

আয়েশা রা. বলেন, ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত রসূল সা. একাধারে তিনদিন গমের রুটি পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করেছেন এমন সুযোগ তাঁর জীবনে আসেনি।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর পরিবারের লোকজন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, অথচ তাঁরা কোনোদিন তৃপ্তি সহকারে যবের রুটি খেতে পাননি।

উরওয়া ইবনে যুবায়ের রা. বলেন, আমার খালা আয়েশা রা. বলতেন, আমাদের উপর দিয়ে কয়েকটি নতুন চাঁদ উদিত হতো, অথচ রসূলুল্লাহ সা. এর ঘরে (চুলায়) কোনো আগুন জ্বলতো না। আমি বললাম, খালাম্মা! আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করতেন। তিনি জবাবে বলেন : দুটি কালো জিনিসের মাধ্যমে অর্থাৎ খেজুর ও পানি দিয়ে। -আখলাকুন নবী : আবু শাইখ ইসফাহানি।

* * *

৭

মহোত্তম চরিত্রের অনুপম ছবি

রসূলুল্লাহ সা. এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এপর্যায়ে আমরা কয়েকজন সাহাবির কয়েকটি অনুপম বর্ণনা উল্লেখ করছি। এ বর্ণনাগুলোতে তাঁর জীবন পদ্ধতি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সমগ্র দিকের উপর অতি সংক্ষেপে আঁকা হয়েছে এক অনুপম ছবি। দেখুন সে ছবি :

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রা.-এর আগের ঘরের ছেলে হিন্দ ইবনে আবি হালা বলেন : রসূলুল্লাহ সা. সব সময় আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অধিকাংশ সময় তিনি চুপ থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। কথা বলার সময় প্রতিটি কথা পৃথক পৃথক উচ্চারণ করে স্পষ্ট ভাষায় বলতেন। তাঁর কথাবার্তা ছিলো পরিচ্ছন্ন, মৌলিক ও অকাট্য। তিনি কঠোর ভাষী ছিলেন না। আবার ব্যক্তিত্বহীনও ছিলেন না।

তিনি কাউকে লজ্জা দিতেন না। অপমানিত করতেন না কাউকেও। তিনি আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের কদর করতেন। খাবার সামনে এলে কখনো দোষ বলতেন না। কোনো জাগতিক বিষয়ে তিনি কখনো রাগ করতেন না। কিন্তু আল্লাহর অধিকার নষ্ট হতে দেখলে অত্যন্ত রাগ করতেন। নিজের জন্যে কখনো রাগ করেননি।

প্রতিশোধ নেননি কখনো। অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন। তখন তার শিশির স্বচ্ছ মুক্তার মতো দাঁতগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতো। - শামায়েলে তিরমিযি।

আনাস রা. বলেন : তিনি ছিলেন সবচে' ভদ্র, কোমল ও অমায়িক মানুষ। তিনি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। সবার সাংসারিক খোঁজ-খবর নিতেন। শিশু-কিশোরদের সাথে হাস্যরস করতেন। শিশুদের আদর করে কোলে তুলে বসাতেন। ছোট বড়ো সকলের দাওয়াত তিনি কবুল করতেন। দূরে হলেও গিয়ে রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ খবর নিতেন। তিনি মানুষের ওযর কবুল করতেন। (মিশকাত)।

রসূলে করিম সা.-এর মহোত্তম জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় সাথি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

তিনি কখনো অশ্লীল কথা বলেননি। কখনো মন্দ কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোয়নি। তিনি ভনিতা করেননি কখনো। হাটে বাজারে চিৎকার করে কথা বলেননি। অন্যায়ের বদলে অন্যায় করেননি। মন্দের মোকাবিলা করেছেন ন্যায় ও ক্ষমাশীলতা দিয়ে। জিহাদের ময়দান ছাড়া কারো উপর তিনি হাত তোলেননি। সেবকদের কখনো মারেননি। নিজের জন্যে কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি। দুটি জিনিসের একটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকলে সহজটি বেছে নিতেন। নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ধুতেন। বকরীর দুধ নিজ হাতে দুহন করতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। মানুষের মন রক্ষা করতেন। কারো মনে কষ্ট দিতেন না। সব সাথিদের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর ব্যবহার ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। কারো কথা শুনার সময় মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বিরক্ত হতেন না। আল্লাহকে স্মরণ করে ওঠা বসা করতেন। উপস্থিত সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট রাখতেন। প্রত্যেকেই মনে করতো, তাঁর কাছে সে-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। কেউ কথা বলতে চাইলে তার প্রয়োজন মতো সময় দিতেন। তিনি সকলের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। তিনি কারো দোষ দিতেন না। ঝগড়া বিবাদ করতেন না। অহংকার করতেন না। অর্থহীন কথাকাজ থেকে তিনি নিজকে বিরত রাখতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তাঁর সাথিরা পিনপতন নিরবতা অবলম্বন করতো। তাঁর কথা শেষ হলেই তারা কথা বলতো। কারো কথার মাঝে তিনি কথা বলতেন না। তিনি অমায়িক ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। ছিলেন বিশ্বস্ত, কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর সাথিরা ছিলেন তাঁর জন্যে পাগলপারা। (শামায়েলে তিরমিযি)।

রসূলুল্লাহ সা. এর নাতি হাসান ইবনে আলী রা. বলেন, আমি আমার পিতাকে নবী সা. এর গৃহ মধ্যকার কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্যে এ অনুমতি ছিলো, তিনি যখনই ইচ্ছা করতেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর গৃহে প্রবেশ করতে পারতেন। তিনি বলেন রসূল সা.-এর অভ্যাস ছিলো, যখনই ঘরে যেতেন, তাঁর সময়কে তিন ভাগ করে নিতেন। এক ভাগ আল্লাহর ইবাদতের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ নিজ পরিবার পরিজনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ নিজের বিশ্রামের জন্য। আবার নিজ আরামের সময়টুকুও লোকজনকে দিয়ে দিতেন। আর বিশেষ লোকদের মাধ্যমে তার উপকারিতাও সাধারণ লোকদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতেন। অর্থাৎ ঐ সময় বিশেষ বিশেষ সাহাবি প্রবেশ করতেন এবং তাঁর কাছে দীনি

মাসায়েল ও দীনের মর্মকথা শ্রবণ করে সাধারণ লোকদের মধ্যে পৌঁছে দিতেন। তাঁদের নিকট কোনো কথা গোপন রাখতেন না। দীন ও দুনিয়ার লাভজনক সব কথাই বলতেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো, উম্মতের জন্য নির্ধারিত সময়ে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী জ্ঞানীদেরকে প্রাধান্য দিতেন এবং ঐ সময়ের বন্টনে দীনি মর্যাদা হিসাবে তারতম্য ঘটতো। তাদের মধ্যে কারো থাকতো একটি কাজ, কারো দুটি কাজ এবং কারো কয়েকটি কাজ। তিনি তাদের কাজে লেগে যেতেন এবং তাদেরকেও ঐসব কাজে মশগুল রাখতেন। তাতে তাদের এবং উম্মতের সংশোধন হতো। তিনি তাদের সমস্যাবলী জানতে চাইতেন এবং তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দিতেন। বলতেন, যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেনো তা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। (তিনি বলতেন) আমাকে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন অবগত করো, যে তার প্রয়োজনের কথা আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না।

সাহাবিগণ তাঁর নিকট ইলম ও দীনের অন্বেষী হয়ে যেতেন। পূর্ণ তৃপ্তি ছাড়া সেখান থেকে ফিরতেন না। আর যখন তারা সেখান থেকে বের হতেন, তখন পথ-প্রদর্শক হয়ে বের হতেন।

রসূলুল্লাহ সা. এর নাতি হুসাইন রা. বলেন, আমি (আমার পিতাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সা.-এর ঘরের বাইরের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুটা বলুন, অর্থাৎ গৃহের বাইরে তিনি কি কাজকর্ম করতেন? তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ সা. অনর্থক কথাবার্তা থেকে স্বীয় যবান মুবাররককে রক্ষা করতেন। মানুষের মনোযোগ নিজের প্রতি আকৃষ্ট রাখতেন। অমনোযোগী হতে দিতেন না। প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাকেই তাদের নেতা ও অভিভাবক বানাতেন। তিনি মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু কারো সাথে স্বীয় আন্তরিকতা ও প্রফুল্লচিত্ততার ক্ষেত্রে তারতম্য করতেন না। নিজ সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নিতেন। মানুষকে তাদের হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন। ভালো কথাকে ভালো বলতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। আর মন্দ কথাকে মন্দ বলতেন এবং তার নিন্দা করতেন। তাঁর প্রতিটি কাজে ভারসাম্য বজায় থাকতো এদিক-ওদিক ঝুঁকে পড়তেন না। তিনি মানুষের প্রতি খেয়াল রাখতেন যাতে কেউ বিরক্ত কিংবা অতিষ্ঠ না হয়ে পড়ে। প্রত্যেক অবস্থার জন্যই তাঁর নিকট উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো। সত্য গ্রহণে ত্রুটি করতেন না এবং সত্য ত্যাগ করেও অন্যদিকে চলে যেতেন না। তাঁর

সংগি-সাথিরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর কাছে সবার সেরা ব্যক্তি ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সবার মঙ্গল কামনা করতেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ছিলেন সে ব্যক্তি, যিনি ছিলেন মানুষের সমব্যথী এবং তাদের ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম।

হুসাইন রা. বলেন, অতপর আমি (আমার পিতাকে) রসূলুল্লাহ সা.-এর মজলিস ও উঠাবসার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ সা. উঠতে বসতে আল্লাহর যিকর করতেন। তিনি কোনো স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করতেন না। তিনি যখন মানুষের সাথে বসতেন, তখন যেখানেই বসার স্থান পেতেন বসে পড়তেন এবং মানুষকেও এরূপ করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি তাঁর মজলিসের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতেন।

কেউ একথা অনুভব করতো না যে, সে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি (কোনো প্রয়োজনে) তাঁর কাছে এসে বসতো কিংবা উঠে যেতো, তিনি তার সাথে নিজেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখতেন, যে পর্যন্ত না সে নিজেই চলে যেতো। কেউ যদি তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইতে আসতো, সে তার বাসনা পূরণ করে ফিরে যেতো, কিংবা কোমল ব্যবহার ও সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যেতো। তাঁর ব্যবহার সমস্ত লোকের জন্য সমান ছিলো।

স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে, তিনি ছিলেন তাদের পিতা। আর লোকেরা সব (অধিকারের ক্ষেত্রে) তাঁর নিকট ছিলো সমান। তাঁর মজলিস ছিলো ধৈর্যশীলতা, লজ্জাশীলতা, সত্যতা ও আমানতের মজলিস। সেখানে উচ্চস্বরে কথাবার্তা হতো না। কারো ইযযত-আব্রুর উপর কলংক আরোপ করা হতো না। কারো দোষক্রটি সমালোচিত হতো না। সভার সদস্যদের মধ্যে ছিলো সংযতভাব। তাকওয়া বজায় থাকতো। এক অপরের সাথে ভদ্র ও নম্র আচরণ করতো। বড়দের শ্রদ্ধা করতো, ছোটদের স্নেহ করতো। অভাবগ্রস্তদের প্রাধান্য দিতো। অপরিচিত আগন্তুকদের প্রতি খেয়াল রাখতো

হুসাইন রা. বলেন, অতপর আমি (আমার পিতাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সভার সদস্যদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সা.তাঁদের সাথে আনন্দচিত্তে মিলিত হতেন। তিনি নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। কঠোর ছিলেন না। তিনি হাট-বাজারে হৈ হুল্লোড় করতেন না। অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতেন না। কাউকে দোষারোপ করতেন না।

অহেতুক কারো প্রশংসাও করতেন না। অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতেন এবং এ ব্যাপারে মানুষ তাঁর সম্পর্কে নিরাশ হতো। তিনি সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এক. ঝগড়া-বিবাদ থেকে। দুই. বেশি কথা বলা থেকে। তিন. অর্থহীন কাজ থেকে। তিনটি বিষয় থেকে তিনি অন্য মানুষকে রক্ষা করেছিলেন। এক. তিনি কারো কুৎসা রটনা করতেন না।

দুই. কাউকে লজ্জা দিতেন না। তিনি. কারো দোষ অন্বেষণ করতেন না। যে কথা বললে সওয়াবের আশা করা যেতো, তিনি তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন সভাসদগণ তাদের মাথা এমনভাবে ঝুঁকিয়ে রাখতেন যেনো তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তিনি যখন কথা বন্ধ করতেন তখন অন্যরা কথা বলতেন। তাঁর সামনে কেউ কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। যখন কেউ কোনো কথা শুরু করতেন, তখন অন্যরা তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরব থাকতেন।

তাদের মধ্যে প্রত্যেকের কথাই তার নিকট ততটুকু গুরুত্বের অধিকারী হতো, যতটুকু গুরত্ব পেতো প্রথম ব্যক্তির কথা। সবাই যে কথা শুনে হাসতো, তিনিও তাতে হাসতেন। সবাই যাতে আশ্চর্য হতো, তিনিও তাতে আশ্চর্য হতেন। আগন্তুকের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও প্রশ্ন তিনি ধৈর্য সহকারে শুনতেন। তাঁর সাহাবীগণ এরূপ লোকদের তাঁর নিকট নিয়ে আসতেন (যাতে তাদের প্রশ্ন থেকে নতুন বিষয় জানা যায়)।

তিনি বলতেন, তোমরা যখন কোনো অভাবগ্রস্তকে তার অভাব দূর করার প্রার্থনা করতে দেখো, তখন তাকে সাহায্য করো। কেউ তার প্রশংসা করুক, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে কেউ কৃতজ্ঞতা বশত কিছু বললে তা ছিলো স্বতন্ত্র। তিনি কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। অবশ্য সে যদি সীমা অতিক্রম করে যতো, তবে তার কথার প্রতিবাদ করতেন। হয়তো তাকে নিষেধ করতেন, কিংবা সেখান থেকে নিজে উঠে দাঁড়াতেন।

হাসান রা. বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ সা. এর চুপ থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমার পিতা বললেন : রসূলুল্লাহ সা. চুপ থাকতেন চারটি কারণে। এক. সহনশীলতার কারণে. দুই. সাবধানতার কারণে, তিন. আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে, চার. চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। তাঁর আন্দাজ করা ছিলো অবস্থার উপর পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করা এবং মানুষের আলাপ-

আলোচনা শ্রবণ করা। আর তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন সেসব বিষয়ে, যা অবশিষ্ট থাকে এবং বিলীন হয় না। আর সহনশীলতা তাঁর ধৈর্যের মধ্যেই একত্রিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ কোনো বিষয় তাঁকে ক্রুদ্ধও করতে পারতো না এবং অস্থিরও করতে পারতো না। আর সাবধানতা তাঁর জন্য চারটি জিনিসের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে। (আর তা হচ্ছে) তিনি উত্তম বস্তুটি গ্রহণ করতেন, যাতে মানুষ তা গ্রহণ করে।

তিনি মন্দবস্তু পরিত্যাগ করতেন, যাতে মানুষ তা থেকে বিরত থাকে। যে জিনিসে তাঁর উম্মতের সংশোধন হতো, তিনি তার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করতেন। আর যাতে তাদের কল্যাণ হতো, তিনি তা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেন। এভাবে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ একত্রিত ও সমন্বিত করেন। -আখলাকুন নবী : আবু শাইখ ইসফাহানি।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দশ বছর আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহচর্যে ছিলাম এবং সব রকমের আতরের ঘ্রাণ আমি নিয়েছি। কিন্তু তার মুখের ঘ্রাণ থেকে উত্তম কোনো ঘ্রাণ আমার নাক স্পর্শ করেনি। সাহাবাদের মধ্যে কারো সাথে যখন তাঁর সাক্ষাত হতো, তখন তিনি তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং যে পর্যন্ত সে তাঁর থেকে পৃথক না হতো, তিনি নিজে তার হাত মুবারক গুটিয়ে নিতেন না।

কোনো সাহাবি যখন তার সাথে মিলিত হয়ে তাঁর কানে কানে কোনো কথা বলতে চাইতেন, তখন তিনি নিজ কান তার দিকে পেতে দিতেন। এবং ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কান সরিয়ে নিতেন না, যতোক্ষণ না ঐ ব্যক্তি নিজেকে না সরিয়ে নিতো। -শামায়েলে তিরমিযি।

* * *

৮

রসূলুল্লাহ সা.-এর সমাজ বিপ্লব

১. বিপ্লবের নবী

ইসলাম মানুষের জন্যে। মানুষেরই জীবনাদর্শ। জীবন পথের মূলনীতি। জীবন যাপনের ব্যবস্থা। আদর্শ জীবনের রূপরেখা। এই ইসলাম মানুষের জন্যে প্রেরণ করেছেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, মানুষের মালিক ও মনিব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি নিজেই এই জীবনাদর্শ, এই জীবন ব্যবস্থা মানুষের জন্যে মনোনীত করেছেন। মানুষের জন্যে মনোনীত এটা তাঁর চিরন্তন ব্যবস্থা। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কালের মানুষের জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন।

মানুষের কাছে তাঁর এই জীবন ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থাও তিনি নিজেই করেছেন। সকল কালে সকল জাতির মধ্য থেকে সেরা মানুষদের তিনি তাঁর এই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে নিয়োগ করেছেন। এ জন্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা দান করেছেন। এঁদের আমরা নবী রসূল বলে জানি। মুহাম্মদ সা. এই নবুয়্যতি মালার শেষ কড়ি।

কুরআনে বলা হয়েছে, রসূলদের কিতাব এবং মীযান দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে মানব সমাজ ন্যায়, সুবিচার, সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও ইনসাফের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (সূরা আল হাদীদ,আয়াত : ২৫)।

আল কুরআনেরই অন্য একটি স্থানে নবীদের নাম উল্লেখ করে করে বলা হয়েছে যে, তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'দীন কায়েম করো'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের নবী নিযুক্ত করে বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মাধ্যমে যে বাণী, যে ব্যবস্থা ও আদর্শ প্রেরণ করছি, তা তোমরা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করো। আর এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.কেও একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। একই জীবন ব্যবস্থা নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আর এই জীবন ব্যবস্থা বিজয়ী করার নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য হলো :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

“তিনি সেই সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত (পথ নির্দেশ) এবং সত্য দীন (জীবন ব্যবস্থা ও জীবন যাপনের বিধান)সহ পাঠিয়েছেন, যেনো সে এই বিধানকে অন্যসকল বিধি ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে দেয়।” (সূরা আল ফাতাহ : আয়াত ২৮)

এখানে, কুরআনের এই আয়াতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহকে প্রেরণের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তাতেই অনুরণিত হচ্ছে ইসলামি সমাজ বিপ্লবের পদধ্বনি। এখানে এক চূড়ান্ত বিপ্লব সাধনের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন সাধনের কথা বলে দেয়া হয়েছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত চিন্তাধারা, সমস্ত আচার আচরণ, সমস্ত কুনীতি কুনৈতিকতা এবং সামাজিক সকল অপব্যবস্থা চুরমার করে ভেঙ্গে দিয়ে অবদমিত করে দিতে বলা হয়েছে। বস্তুত, এই কাজটার নামই হলো ইসলামি বিপ্লব।

এই বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ থেকে কতগুলো ধ্যানধারণা, মূলনীতি, জীবনাচার এবং এসবের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোকে পরাজিত, অবদমিত এবং নিস্তেজ করে দেয়া হয়। কুরআন মজীদে এসব জিনিসকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন : কুফর, শিরক, তুগীয়ান, ফিস্‌ক, ফিতনা, ফাসাদ ইত্যাদি। এগুলোকে উৎখাত এবং পরাজিত করে সে স্থলে ইসলামি জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামি বিপ্লবের লক্ষ্য। মূলত রসূলুল্লাহর সা. উপর এ দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি আল্লাহ তা'আলার পর্যবেক্ষণের অধীনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সর্বোত্তম পন্থায় সুনিপুণভাবে এ মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

২. ইসলামি বিপ্লবের মডেল

রসূলুল্লাহ সা. পূর্ণাঙ্গ ইসলামি বিপ্লব সাধন করেছেন। যেসব জিনিসকে পরাভূত ও পরাজিত করার দায়িত্ব ছিলো, তিনি সেগুলোকে পরাভূত ও পরাজিত করে গেছেন। যেসব জিনিসকে বিজয়ী করার নির্দেশ ছিলো, সেগুলোকে তিনি বিজয়ী করে গেছেন। চিরদিনের জন্য বিশ্বের বুকে ইসলামের শিকড়কে এমন মজবুতভাবে তিনি গেড়ে গেছেন, যা নির্মূল করার ক্ষমতা আর কোনো শক্তির নেই।

তাই, ইসলামি বিপ্লবের তিনি স্থপতি। ইসলামি বিপ্লবের তিনি সর্বকালের নেতা। সকল যুগের ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের তাঁরই পদাংক অনুসরণ করতে হবে। নেতাদেরকেও তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। কর্মীদেরকেও তাঁরই অনুসরণ

করতে হবে। তিনি যে বিপ্লব সাধন করেছেন, অনুরূপ বিপ্লব সাধন করার নামই 'ইসলামি সমাজ বিপ্লব'। তিনি ইসলামি সমাজ বিপ্লবের মডেল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৩. রসূলুল্লাহর সংঘটিত বিপ্লবের তিনটি পর্যায়

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন, তার কয়েকটি পর্যায় ছিলো। মূলত, তাঁর বিপ্লবের তিনটি পর্যায় ছিলো। সেগুলো হলো :

১. চিন্তার বিপ্লব বা মানসিক বিপ্লব।

২. নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লব এবং

৩. সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব।

এই তিন পর্যায়ের বিপ্লবের মাধ্যমেই নবী করিম সা.-এর ইসলামি বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসে। সমাজে পূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার নিশ্চিত হয়। বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। মানুষ পতংগের মতো ছুটে আসে এই মহান জীবনাদর্শ গ্রহণ করার জন্য।

রসূলে করিম সা. যে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন তা ছিলো একটি নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লব। কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তাঁর আদর্শকে জাতির উপর জোর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেননি। সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর নেতৃত্ব কব্জা করে অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাভূত করে তিনি ক্ষমতা দখল করেননি।

কোনো প্রকার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেও তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেননি। মোট কথা এ ধরনের কোনো কৃত্রিম পন্থায় ক্ষমতায় আরোহণ তিনি করেননি। নিজের আদর্শকেও তিনি জনগণের উপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতার বলে চাপিয়ে দেননি। তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতা তাঁর হাতে এসে যায়।

তিনি মূলত, প্রথমে জনগণের মধ্যে চিন্তা ও চরিত্রের বিপ্লব সাধন করেন। আর এই চিন্তা ও চরিত্র বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব।

চিন্তার বিপ্লব

তিনি প্রথমেই জনগণের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করে দেন। তাঁর জাতির লোকেরা চিন্তার ক্ষেত্রে যে অন্ধতায় নিমজ্জিত ছিলো, তিনি সজোরে সে অন্ধকার পর্দায় আঘাত করেন। তাদের অচেতন অনুভূতিকে সচেতন করে দেন। তাদের বিবেককে জাগ্রত করে দেন। তাদের চোখের পর্দা সরিয়ে দেন। কানের তালা খুলে দেন। দিলের কালিমা দূর করে দেন।

তারা আল্লাহ আছেন বলে জানতো। কিন্তু তারা তাঁকে কেবল ভালোমন্দের দেবতা বলেই মনে করতো। তারা মনে করতো, তাঁকে খুশি করলে তাদের পার্থিব জীবনে কল্যাণ হবে, আর অখুশি করলে তাদের হবে অকল্যাণ। কিন্তু কিসে তিনি খুশি হন আর কিসে অখুশি হন, তা তারা জানতো না। এ ব্যাপারে তারা নিজেদের মনগড়া চিন্তার ধারক বাহক ছিলো। তাছাড়া তারা মনে করতো সরাসরি মানুষ তাঁকে খুশি করতে পারে না। মানুষের আরাধনা সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছে না। এ ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের মনগড়া মাধ্যম সাব্যস্ত করে নিয়েছিল।

এভাবে তারা আল্লাহর সাথে অসংখ্য মনগড়া অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল। পরকালের জীবন সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা ছিলনা। পার্থিব জীবনের পাপ, অন্যায়, যুল্ম, অত্যাচার, অধিকার হরণ ইত্যাদির জন্যে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে বলে তাদের কোনো ধারণা ছিলনা। এভাবে আল্লাহর বিধান এবং তাঁর একত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে তারা ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

রসূলুল্লাহ সা. অহীর সাহায্যে তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন। অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেন। তাদের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে দেন। তাদের মধ্যে মানসিক বিপ্লব সংঘটিত করে দেন। ক্ষুরধার যুক্তি পেশ করেন, তাদের জীবন ও জগত থেকে অকাট্য প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসমূহ তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। সেই সাথে মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে তাদের মনের বদ্ধ দরজা উন্মুক্ত করে দেন। এভাবে তাদের মনে ও মগজে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেন যে :

আল্লাহ এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। কোনো প্রতিপক্ষ নেই। কোনো আত্মীয় নেই। স্বজন নেই। তিনি সরাসরি মানুষের কথা শুনেন। আরাধনা

শুনেন। তিনি ঘাড়ের মোটা রগটির চাইতেও মানুষের নিকটতর। তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার খলিফা-প্রতিনিধি। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী। দুর্দণ্ড প্রতাপশালী তিনি। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন ও দেখেন।

মৃত্যুর পর তিনি সব মানুষকে জীবিত করবেন। পৃথিবীর জীবনে তারা তাঁর পূর্ণ অনুগত হয়ে চলেছিল কিনা; পূর্ণভাবে তাঁর দাসত্বের জীবন যাপন করেছিল কিনা; কিয়ামতের দিন তিনি এসব কিছুর হিসেব নেবেন।

পৃথিবীর জীবনে প্রতিটি মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এসব রেকর্ড এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সেদিন তিনি বিচার করবেন। বিচারে যারা কৃতকার্য হবে, তাদের চিরদিনের জন্যে চিরসুখের জান্নাতে তিনি থাকতে দেবেন। আর অকৃতকার্য হলে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্থান জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

মুহাম্মদ সা. কে তিনি নিজের রসূল মনোনীত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে মানুষের জন্যে জীবন যাপনের বিধান প্রদান করেছেন। কিভাবে জীবন যাপন করলে তিনি খুশি হবেন আর কী কী কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, তার মাধ্যমে এসব কিছু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং যারা মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করবে এবং তিনি যেভাবে চলতে বলেন, সেভাবে জীবন যাপন করবে, পরকালে কেবল তারাই মুক্তি পাবে এবং জান্নাতের অধিকারী হবে। আর যারা তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহ্‌র বিধানের অনুসরণ করবে না এবং তাঁর দেখানো পথে চলবে না, পরকালে তারাই অকৃতকার্য হবে এবং প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

চরিত্র বিপ্লব

চিন্তার ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে এই পরিবর্তন, এই বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল, সাথে সাথে তাদের চরিত্রের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। সংঘটিত হচ্ছিলো চরিত্র বিপ্লব। এতোদিন তারা অসংখ্য খোদার পূজা অর্চনা করতো, এখন এক আল্লাহর ইবাদত করে। এতোদিন অসংখ্য শক্তির আনুগত্য করতো, এখন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করে না।

এতোদিন অসংখ্য দেবতাকে খুশি করার জন্য কাজ করতো, এখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে। এতোদিন পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করতো, অসংখ্য রসম রেওয়াজ মেনে চলতো, এখন শুধুমাত্র আল্লাহর রসূলের অনুসরণ করে। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের পরিবর্তন আসে।

এখন তারা সত্য কথা বলে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। কাউকেও ঠকায় না। প্রতারিত করে না। কারো সম্পদ অপহরণ করে না। জিনা ব্যভিচার করে না। অপবাদ রটায় না। অবৈধ উপার্জন করে না। সুদ খায় না, দেয় না। ঘুষ খায় না, দেয় না। কারো মনে কষ্ট দেয় না। কন্যা সন্তানদের ঘৃণা করে না। পারস্পরিক হানাহানি, কাটাকাটিতে লিপ্ত হয় না।

এখন একে অপরের কল্যাণের জন্যে ব্যস্ত। একজন আরেকজনের ভাই। এখন তারা এতীম আর মুসাফিরের সম্পদ লুণ্ঠন করে না। এখন নিজেদের সম্পদ সকলের জন্যে অবারিত দান করে। যে কোনো প্রকার পাপ ও অন্যায়ের জন্যে এখন তারা আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এতোদিন তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত ছিলো দুনিয়া লাভের জন্যে। এখন তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে পরকালীন সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে।

সমাজ বিপ্লব

এভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. সমাজে দুটি ধারা সৃষ্টি করে দিলেন। একটি হলো প্রচলিত ধারা, যারা শিরক ও কুফরের উপর অটল থেকে নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে রেখেছে। অপরটি হলো, তাঁর সৃষ্ট বিপ্লবী ধারা, যাদের মানসিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, নৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং চরিত্র জগতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সহসাই দুটি ধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ বাধে। কায়েমি স্বার্থবাদী ধারা বিপ্লবী ধারাকে কিছুতেই বরদাশত করে না। বিপ্লবী ধারা দিন দিনই জোরদার হচ্ছে দেখে তারা বিরোধিতার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। চরম অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার এদের উপর চাপিয়ে দেয়। বিপ্লবী ধারা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এসব কিছুই অকাতরে বরদাশত করে।

কিন্তু রসূলে পাকের সৃষ্ট এই বিপ্লবী ধারা ছিলো যেহেতু সত্যের বাহক, মুক্তির আহ্বায়ক, তাই দিন দিন তাদের জনবল এবং মনোবল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কোনো সংঘাত সংঘর্ষে তাদের আদর্শিক চরিত্র ও মানসিকতা পরাজিত হয় না। জনমত তাদের পক্ষে আসতে থাকে। অবশেষে এমন এক সময় এসে উপস্থিত হয়, যখন কতিপয় কায়েমি স্বার্থবাদী ছাড়া আর সকলেই হয়তো এই বিপ্লবী ধারার সক্রিয় কর্মী হয়েছে, নতুবা হয়েছে সমর্থক।

এভাবে রসূলে করিম সা. জনগণের চিন্তা ও চরিত্র বিপ্লবের এক স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাজ বিপ্লব সাধন করেন। জনগণের স্বাভাবিক আকাংখার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তার করায়ত্তে এসে যায়। জনগণের মানসিক ও নৈতিক দাবির প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে রসূলে করিম সা. এভাবেই ইসলামি বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে ইসলামের প্রাসাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। জনমত ও গণতন্ত্রের এর চাইতে শ্রেষ্ঠ উপমা আর হতে পারেনা।

৪. ইসলামি বিপ্লবের পথিকৃত

এটা ছিলো মূলত বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর কর্মসূচির সাফল্য। তিনি কোনো তড়িৎ সফলতা লাভের কর্মসূচি গ্রহণ না করে এই সুদূরপ্রসারী দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচি অবলম্বন করেন। এরি ফলে তাঁর সংঘটিত বিপ্লব মানুষের মনের গহীনে শিকড় গেড়ে নিয়েছিল। মানুষ স্বেচ্ছায় দলে দলে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে।

অবশ্য কর্মসূচির এই বিশুদ্ধতা ছাড়াও তাঁর বিপ্লব সফল হবার পিছে কাজ করেছিল তাঁর নেতৃত্বসূলভ মহোত্তম গুণাবলী। তাছাড়া তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং দাওয়াত ও আহ্বানের বাস্তব ও ঐকান্তিক কর্মকৌশল। এছাড়া তিনি এবং তাঁর সাথিরা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে নিজেদের জীবনে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন। আল্লাহ প্রদত্ত পথ নির্দেশনাকে তাঁরা নিজেদের পথের সম্বল বানিয়ে নেন। অহীর জ্ঞানই ছিলো তাঁদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান।

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে এ জ্ঞানের অনুসরণকেই তাঁরা সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করতেন। তাঁরা আল্লাহর প্রতি একমুখী হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাকেই তাঁরা একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্য তাদের এ লক্ষ্য পথে বাদ সাধেনি। যখনই অন্য কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্য এ মহান লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে তারা টের পেতেন, সাথে সাথে সেটাকে নিক্ষেপ করে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেন।

এভাবে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

এ সকল কার্যকারণের ফলশ্রুতিতেই সংঘটিত হয় রসূলুল্লাহ সা.-এর মহান ইসলামি বিপ্লব। আজকের যুগেও এবং কিয়ামত পর্যন্ত যখনই কেউ বা কোনো মানবগোষ্ঠী যখন ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত করতে চাইবেন, তাদেরকে অবশ্যি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা.-কে অনুসরণ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর কর্মনীতির অনুবর্তন করতে হবে।

তিনি যেভাবে যে দাওয়াত মানুষকে দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে সে দাওয়াতই মানুষকে দিতে হবে। তিনি মানুষের মন মগজ থেকে যেসব জিনিস দূর করেছিলেন, সেসব জিনিসই আজো দূর করতে হবে। তিনি যেভাবে চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটাতে হবে। তিনি মানুষের নৈতিক চরিত্রকে যেভাবে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছিলেন, আজো ঠিক সেভাবেই মানুষের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

তিনি যে সূত্র থেকে জ্ঞান দান করেছিলেন, সে সূত্র থেকে জ্ঞানদান করতে হবে। নেতা হিসেবে তিনি যেসব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, আজকের যুগের নেতাদেরকেও সেসব গুণাবলী অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর সাথিদের আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁদের মতো আল্লাহর প্রতি একমুখী হয়ে যেতে হবে। আর এ কাজকেই সব কাজের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবেই এখন এবং ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে তাঁর প্রদর্শিত ইসলামি বিপ্লব।

* * *

৯

নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহর একগুচ্ছ বাণী

কুরআন মজীদে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে বেশ কিছু নির্দেশিকাই আছে। রসূলুল্লাহ সা.-এর এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভকারীদের কী ধরনের নীতি ও আচরণ গ্রহণ করা উচিত, সেই হিদায়াতও দেয়া হয়েছে। সেই হিদায়াতের আলোকে রসূলুল্লাহ সা. কী ধরনের নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা এ পুস্তকের শুরু থেকে আলোচনা করে এসেছি।

এবার আমরা তুলে ধরবো, ইসলামি নেতৃত্বের আদর্শ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এর কিছু বাণী। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আনুগত্য ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে তিনি কী ধারণা ও নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন, সেসব বাণী। সরাসরি হাদিস পেশ করবো। একগুচ্ছ হাদিস নিয়ে এসেছি। হাদিসের বাগান থেকে চয়ন করে আনা সুরভিত ফুল এগুলো। যে কেউ এগুলো দিয়ে মালা গেঁথে নিতে পারে নিজের জন্যে, কিংবা তৈরি করে নিতে পারেন মালঞ্চ। নিম্নে পেশ করা হলো একগুচ্ছ হাদিস- রসূলুল্লাহ সা. এর অমর বাণী :

১. যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি আমীরের (ইসলামি নেতা ও শাসকের) আনুগত্য করলো, সে আমার আনুগত্য করলো। আর যে আমীরের অবাধ্য হলো, সে আমার অবাধ্য হলো। মূলত নেতা হলো ঢালস্বরূপ।

কারণ তার নেতৃত্বেই লড়াই করা হয় এবং নিরাপদে থাকা হয়। তাই নেতা যদি আল্লাহভীতি নিয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে এবং শাসিত, পরিচালিত ও অধীনস্থদের প্রতি সুবিচার করে তবে এর প্রতিদান ও প্রতিফল সে লাভ করবে। আর আল্লাহভীতি ও সুবিচার ত্যাগ করলে এর সাজা তাকে ভোগ করতে হবে। -বুখারি ও মুসলিম, বর্ণনা : আবু হুরাইরা রা.।

২. যদি কোনো বিকলাংগ কুৎসিত ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তবে তোমরা তার কথা শুনো ও মানো, যতোক্ষণ সে আল্লাহর কিতাব মাফিক তোমাদের পরিচালিত করে। -সহীহ মুসলিম : উম্মুল হুসাইন রা.।

৩. নিজের পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ, উভয় অবস্থাতেই নেতার নির্দেশ পালন করা মুসলিম ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য, যতোক্ষণ না আল্লাহর অবাধ্য হবার নির্দেশ দেয়া হয়। তবে, যখনই আল্লাহর অবাধ্য হবার মতো কোনো কাজের নির্দেশ দেবে, তখন তার কথা শুনাও যাবে না, মানাও যাবে না। (বুখারি ও মুসলিম : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.)।

৪. (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের) অবাধ্য হবার মতো নির্দেশের ক্ষেত্রে নেতা আনুগত্য লাভ করবে না। আনুগত্য প্রযোজ্য হবে কেবল মা'রূফ কাজে। (বুখারি ও মুসলিম : আলী রা.)।

৫. কেউ যদি আমীরের (ইসলামি নেতা ও শাসকের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং আল জামা'আত ত্যাগ করে, এ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার সে মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (সহীহ মুসলিম : আবু হুরাইয়া রা.)।

৬. কেউ যদি আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে দলত্যাগ না করে সে যেনো সবর করে। কারণ, যে আল জামা'আত ত্যাগ করা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার সে মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (বুখারি ও মুসলিম : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.)।

৭. তোমাদের নেতাদের মধ্যে তারাই উত্তম নেতা, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে; যাদের জন্যে তোমরা দু'আ করো আর তোমাদের জন্যেও তারা দু'আ করে। তোমাদের নেতাদের মধ্যে মন্দ ও নিকৃষ্ট নেতা তারা, যাদের তোমরা ঘৃণা করো আর তারাও তোমাদের ঘৃণা করে; যাদের তোমরা অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়। (সহীহ মুসলিম : আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রা.)।

৮. আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, হে আবদুর রহমান! নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না, কারণ চাওয়ার কারণে যদি তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, তবে নেতৃত্বের সব দায় দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। আর চাওয়া ছাড়াই যদি তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, তবে দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। (বুখারি ও মুসলিম)।

৯. তোমরা অচিরেই নেতৃত্বের জন্যে লালায়িত হয়ে পড়বে, আর এ কারণে কিয়ামতের দিন তোমরা লজ্জিত হবে। (সহীহ বুখারি : আবু হুরাইয়া রা.)।

১০. তোমরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্যে উত্তম ও উপযুক্ত লোক পাবে তাদের মাঝে, যারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পদকে চরম ঘৃণা করে, যতোক্ষণ না তারা তা লাভের জন্যে সক্রিয় হয়। (বুখারি ও মুসলিম : আবু হুরাইয়া রা.)।

১১. সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জনগণের উপর নিযুক্ত এবং অধিষ্ঠিত নেতাও একজন দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারি ও মুসলিম : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.)।

১২. কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের নেতা বা শাসক থাকার পর যদি দায়িত্ব পালনে বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণা করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারি ও মুসলিম : মা'কাল ইবনে ইয়াসার রা.)।

১৩. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে এই দু'আ করতে শুনেছি : হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের নেতা, শাসক বা পরিচালক করা হয়, সে যদি তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়, যা তাদের জন্যে কষ্টদায়ক, তবে তুমি তার উপরও সেরকম কষ্ট ও বিপদ চাপিয়ে দাও। আর সে যদি তাদের সাথে সদাচরণ করে, তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করো। (সহীহ মুসলিম)।

১৪. আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি : ক. তোমরা জামায়াতবদ্ধ থাকবে খ. নেতার আদেশ শুনবে, গ. নেতার আনুগত্য করবে, ঘ. হিজরত করবে, ঙ. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে এক বিঘত পরিমাণও বেরিয়ে যাবে, সে অবশ্যি নিজের গলদেশ থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলবে। পুনরায় ফিরে এসে দলভুক্ত না হলে সে ইসলামের বাইরেই থাকবে। (তিরমিযি : হারিস আল আশআরী রা.)।

১৫. যে ব্যক্তি দশজন লোকেরও আমীর হবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেঁধে উঠানো হবে। অতপর তার ন্যায়পরায়ণতা তাকে মুক্ত করবে, অথবা তার যুলম ও সীমালংঘন তাকে ধ্বংস করবে। (দারেমি : আবু হুরাইয়া রা.)।

১৬. কা'ব ইবনে উজরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন, হে কা'ব! আমি তোমাকে অজ্ঞ, দাম্ভিক নেতা ও শাসকদের নেতৃত্ব ও শাসনের কবল থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিলাম। আমি বললাম, সেটা কেমন হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন : অচিরেই এ ধরনের নেতাদের আবির্ভাব ঘটবে। যেসব লোক

তাদের কাছে যাবে, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তাদের অন্যায় কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবে, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। তারা হাউজে কাউসারে আমার কাছেও আসতে পারবে না।

আর যারা তাদের কাছে ঘেঁসবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে না, তারাই আমার লোক, আমিও তাদের লোক। তারাই হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হবার আশা পোষণ করতে পারে। (তিরমিযি)।

১৭. কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয়তম এবং নিকটতম হবে ন্যায়পরায়ণ নেতা বা শাসক। আর কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে এবং আল্লাহর থেকে সর্বাধিক দূরে থাকবে যুলুমবাজ নেতা ও শাসক। (তিরমিযি : আবু সায়ীদ রা.)।

১৮. অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ। (তিরমিযি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ : আবু সায়ীদ রা.)।

১৯. আমীর যখন জনগণের দোষক্রুটি খুঁজে বের করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তখন সে তাদেরকে অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। -আবু দাউদ : আবী উমামা রা.।

২০. মু'আবিয়া রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.- কে বলতে শুনেছি : তুমি যখন জনগণের গোপন বিষয় খুঁজতে শুরু করবে, তখন তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। (বায়হাকি)।

২১. তোমরা কি জানো কিয়ামতের দিন পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়ায় কারা সর্বপ্রথম স্থান পাবে? সাহাবিরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন : সেইসব নেতা ও শাসকরা, হক কথা বলা হলে যারা সাথে সাথে তা গ্রহণ করে, অধিকার দাবি করা হলে যারা সাথে সাথে দিয়ে দেয় এবং মানুষের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চালায় ঠিক সেভাবে যেমন চালায় নিজের উপর। (মিশকাত : আয়েশা রা.)।

২২. তোমরা যেমন হবে, তোমাদের নেতা ও শাসকরাও হবে ঠিক সেরকম।

২৩. যে ব্যক্তিকে মানুষের মাঝে বিচারক নিযুক্ত করা হলো, তাকে যেনো ছুরি ছাড়াই জবাই করে দেয়া হলো। (তিরমিযি : আবু হুরাইরা)।

* * *

১০

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর দাওয়াতি কাজের কৌশল

◆ আমাদের উপর দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. সর্বশেষ রসূল হবার ফলে পৃথিবীতে আর কোনো রসূল আসবে না। তাহলে মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব তথা সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে দাওয়াত দেবার দায়িত্ব পালন করবে কে? প্রশ্নটির দীর্ঘ ও বিস্তারিত জবাব দেবার প্রয়োজন নেই।

কারণ এর জবাব সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে দাওয়াত দেবার দায়িত্ব সেই মানব দলটির উপরই অর্পিত হয়েছে, যারা আল কুরআনের বাহক হবার এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. অনুসারী হবার দাবি করবে।

কুরআন এ দলটিকে 'খাইরা উম্মাহ' বা 'সর্বোত্তম আদর্শিক দল' বলে আখ্যায়িত করেছে। আর মানব জাতিকে সুকৃতির নির্দেশ দান, দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখা এবং গোটা বিশ্বমানবতার উপর সত্যের সাক্ষ্য হওয়াই এদলটি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বলে কুরআন ঘোষণা করেছে।

আল্লাহর দাসত্বের আহ্বান, সুকৃতির নির্দেশ দান এবং দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখা তথা ইকামতে দীনের যে কাজ, তার মূল ধারাই হচ্ছে, মানব জাতিকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে দাওয়াত দান। অন্য কথায় ইকামতে দীনের প্রধান কাজ হচ্ছে দাওয়াত ইলাল্লাহ। আর কুরআন তার বাহক দলকে সরাসরি এ দাওয়াতি কাজের নির্দেশ দিয়েছে। ফলে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবী কোনো একটি দিনের জন্যও দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

কুরআনের বাহক দল এ কাজ অব্যাহতভাবে জারি রেখেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ জারি থাকবে। এখানে দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব নয়, বরং কুরআনি নির্দেশের আলোকে রসূল সা. দাওয়াতি কাজে যে মহোত্তম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেসব কৌশল ও টেকনিক আলোচনা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই সেই মূল আলোচনায় আসা যাক।

◆ দাওয়াতি কাজে রসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন নির্দেশিত কৌশল

এ উম্মতের নবীই উম্মতের পয়লা দায়ী বা দাওয়াত দানকারী। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'দায়ী'য়ান ইলাল্লাহ' (আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন বলে আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তিনিই তাঁর উম্মতের জন্য দায়ী ইলাল্লাহর মডেল।

এ কাজ কিভাবে করতে হবে তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ কাজে কোন্ কোন্ পন্থা পদ্ধতি ও টেকনিক অবলম্বন করতে হবে তিনি তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এর বিবরণ রয়েছে। এর নমুনা ও উদাহরণ রয়েছে তাঁর জীবন চরিতে। এখানে কুরআনের আলোকে দাওয়াতি কাজের কয়েকটি মৌলিক পদ্ধতি ও টেকনিক আলোচনা করা গেলো।

১. কথার সৌন্দর্য ও কোমলতা

মানুষকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে কুরআন কথার সৌন্দর্য ও কোমলতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে নবী সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"হে নবী, আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেনো সর্বোত্তমভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষায় কথা বলে।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ৫৩)

সূরা তোয়াহায় মূসা ও হারূণ আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের নিকট দাওয়াতি কাজে পাঠাবার প্রাক্কালে তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"তার সাথে কোমল ও নম্রভাবে কথা বলবে। এ পন্থায়ই উপদেশ গ্রহণযোগ্য হওয়া কিংবা অন্তরে ভয় ঢোকার সম্ভাবনা থাকে।" (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৪৪)

এ হচ্ছে দাওয়াত কার্যকরী হবার প্রভাবশালী পন্থা। দাওয়াত দানকারীকে কোনো অবস্থায়ই মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত কথা বলা যাবে না। কথার খৈ ফুটানো যাবে না। নিজেকে পরহেযগার এবং অপরকে পাপী বলে দাবি করা যাবে না। তার বা তার দলের প্রতি যতোই অপবাদ, অভিযোগ ও আপত্তি তোলা হোক না কেন, তিনি উত্তেজিত হবেন না। সর্বাবস্থায়ই তার মুখমণ্ডল থাকবে হাস্যোজ্জ্বল, ভাষা হবে কোমল মাধুর্যময়, আচরণ হবে বিনয়ী, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয়।

২. পুলিশী কায়দা পরিত্যাজ্য

কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুলিশি কায়দায় চাপ প্রয়োগ করে ইসলামের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করাতে হবে, এ দায়িত্ব দাওয়াত দানকারীকে দেয়া হয়নি। এমন দায়িত্ব নবীরও ছিলনা। দাওয়াতদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে, যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে সত্যরূপে আর বাতিলকে বাতিলরূপে স্পষ্ট করে মানুষের সামনে তুলে ধরে তাকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো। কাউকেও হিদায়াত করা তার দায়িত্ব নয়।

এটা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ স্বয়ং নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন : "আল্লাহ চাইলে তারা শিরক করতো না। আমি তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি আর তুমি তাদের (হিদায়াত করার) দায়িত্বশীল নও।" (সূরা ৬ আল আনআম : আয়াত ১০৭। এই সূরার ১০৪ আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।)

৩. হিকমাহ ও উত্তম উপদেশ

দাওয়াতদানকারীর বক্তব্য তর্ক-বহছ কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধির দাপট দেখানোর জন্যে হবে না। কথার জোরে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মনোভাব তার মধ্যে থাকতে পারবে না। বরঞ্চ তাকে অত্যন্ত যুক্তিসংগত পন্থায় মর্মস্পর্শী উপদেশ পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে :

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তোমার রবের পথের দিকে মানুষকে ডাকো হিকমাহ্ এবং মাওয়িযায়ে হাসানার মাধ্যমে।" (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ১২৫)

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তাঁর তফসিরে লিখেছেন :

"দাওয়াতে হিকমাহ্ প্রয়োগের মানে হচ্ছে, বোকামির সাথে যেনো দাওয়াত দেয়া না হয়, বরং বুদ্ধিমত্তার সাথে শ্রোতার মানসিকতা ও সামর্থ এবং তার ধারণ ক্ষমতা বুঝে উপযুক্ত স্থান, সময় ও সুযোগ অনুযায়ী কথা বলতে হবে। সব ধরনের লোকদের একই ডাণ্ডা দিয়ে সোজা করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া হবে, প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর এমনসব যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তার চিকিৎসা করতে হবে, যা তার মন-মানসিকতার গভীর থেকে সমস্ত রোগের উৎসমূল উপড়ে ফেলতে সমর্থ হবে।

'মাওয়িযায়ে হাসানা' বা উত্তম উপদেশের দুটি অর্থ রয়েছে। এক. শ্রোতাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টাকে যথেষ্ট মনে করা যাবে না। বরং তার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

অন্যায় ও ভ্রান্তিকে শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে দিলেই চলবে না, বরং মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে অন্যায়ের প্রতি যে ঘৃণা ও নফরত রয়েছে তাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। হিদায়াত ও আমলে সালেহর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার যুক্তি ও বুদ্ধিগত প্রমাণই যথেষ্ট নয়, সাথে সাথে এগুলোর প্রতি শ্রোতার আকর্ষণ ও মহব্বত পয়দা করে দিতে হবে।

দুই. সহানুভূতি আন্তরিকতা ও একান্ত দরদের সাথে উপদেশ দান করতে হবে। শ্রোতা যেনো কখনো এমনটি মনে করতে না পারে যে, উপদেশদানকারী তাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করছে এবং নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে তার সাথে বিদ্রূপ করছে।

বরং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেনো শ্রোতা অনুভব করতে পারে যে তার সংশোধনের জন্যে উপদেশদানকারীর অন্তরে সত্যিই দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ আকুতি রয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তার কল্যাণ কামনা করছেন।" -তাফহীমুল কুরআন, সূরা ১৬ আন-নহল, টীকা : ১২২।

৪. বিতর্কের পথ পরিহার

দাওয়াতদানকারী প্রতিপক্ষের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন না। কারণ তর্ক-বহছ এমন একটি জিনিস, যা দাওয়াতদানকারীর উদ্দেশ্য পণ্ড করে দেয়। প্রতিপক্ষের সাথে অধিকতর দূরত্ব সৃষ্টি করে। এতে প্রতিপক্ষ জিদের বশবর্তী হয়ে অধিকতর অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয়। বিতর্ক এমন একটি জিনিস, যাতে উভয় পক্ষই জিততে চায়। আর যেখানে ঠক-জিতের পালা এসে যায়, সেখানে কিছুতেই দাওয়াতি কাজের পরিবেশ থাকে না। তাই কুরআন বলছে :

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ •

"আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।" (সূরা ২৯ আনকাবুত : আয়াত ৪৬)

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ •

"আর লোকদের সাথে তুমি বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়" (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ২৫)

'উত্তম পন্থা' মানে তোমার প্রতিপক্ষ যদি তোমার সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, তবে তুমি তাতে অংশ নেবে কেবল যুক্তি সংগত, প্রমাণসিদ্ধ, সভ্য শালীন এবং বুঝা ও বুঝানোর ভাষায়। তর্কের জন্যে তর্ক এবং যে কোনোভাবে জেতার জন্যে বিতর্কে লিপ্ত হবে না। কারণ তাতে তোমার দ্বারা লোকেরা অধিকতর গোমরাহির দিকে ধাবিত হবে।

৫. ভালো কথা দিয়ে মন্দ কথার জবাব দান

এ ব্যাপারে কুরআন বলছে :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ •

"মন্দকে সেই ভালো দ্বারা দূর করো যা সর্বোত্তম। প্রতিপক্ষ তোমাদের বিরুদ্ধে যেসব কথা রচনা করছে, তা আমি জানি।" (সূরা ২৩ মুমিনূন : ৯৬)

সূরা হামীম আস সাজদায় বলা হয়েছে :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ •

"ভালো আর মন্দ এক নয়। মন্দকে সেই ভালো দিয়ে দূর করো যা সর্বোত্তম।" (সূরা ৪১ হামীম আস সাজদা : আয়াত ৩৪)

সত্য পথের দাওয়াতদানকারী যে কোনো সময় মন্দ আচরণের সম্মুখীন হতে পারেন। কিন্তু মন্দ আচরণের জবাবে তিনিও মন্দ আচরণ করবেন না। তিনি এমন সুন্দর আচরণ করবেন, যদ্দ্বারা মন্দ আচরণকারী লজ্জিত হবে এবং তার আচরণে বিমুগ্ধ হবে।

৬. যাদের পেছনে সময় বেশি দিতে হবে

দাওয়াতের দায়িত্ব পালনে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে একটা সুবিধে দিয়েছেন। তাহলো অভিজ্ঞতার আলোকে যার ব্যাপারে মনে হবে যে, লোকটা উপদেশ (দাওয়াত) গ্রহণ করতে পারে, তার পেছনে সময় বেশি দিতে হবে। আর যার ব্যাপারে মনে হবে যে, তার দাওয়াত গ্রহণ করার কোনো সম্ভাবনা নেই, তার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করার দায়িত্ব মুমিনদের নেই। সূরা আল আ'লায় রসূল সা.-কে বলা হয়েছে :

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ • فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ •

"আমি তোমাকে সহজ পন্থার সুবিধা দিচ্ছি। তাহলো উপদেশ দান সেখানেই অব্যাহত রাখবে, যেখানে তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করবে।" (সূরা আ'লা : আয়াত ৮-৯)

সূরা আবাসায় এ কথাটি আরো বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে।

৭. মা'রূফের প্রতি আহ্বান

কুরআনে নবী করিম সা.-কে বলা হয়েছে : 'ওয়া'মুর বিল উরফি-মা'রূফের আদেশ করো।'

এর ব্যাখ্যায় তফসির তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে : "দাওয়াতদানকারী বড় বড় দর্শন ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের পরিবর্তে লোকদের সরাসরি 'মা'রূফ' মানে– সোজা ও সুস্পষ্ট কল্যাণের শিক্ষা দেবে, যেসব কথাকে সাধারণ মানুষ ভালো কথা বলে জানে কিংবা যা ভালো কথা বলে মনে করার জন্যে তাদের সাধারণ বুদ্ধিই (Common sense) যথেষ্ট হতে পারে।

এ পন্থা গ্রহণের ফলে সত্য পথের দাওয়াতদানকারীর আবেদন সাধারণ ও সুধী সবাইকেই প্রভাবিত করে। শ্রোতার কর্ণকুহর ভেদ করে দাওয়াত আপনিতেই তার মর্মে গিয়ে পৌঁছায়। এমন 'মারূফ' দাওয়াতের বিরুদ্ধে যারা চিৎকার ও হাঙ্গামা করে, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যর্থতা ও দাওয়াতের কামিয়াবির ক্ষেত্র তৈরি করে।" (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ৭ আ'রাফ, টীকা : ১৫০)।

৮. সাহসিকতা

কোনো ভীরু কাপুরুষ ব্যক্তি আল্লাহর দীনের দাওয়াতদানকারী হতে পারেনা। এ কাজের জন্যে প্রয়োজন বিরাট সৎ সাহসের। চরম বিরোধিতার পরিবেশেও দাওয়াতদানকারী নিজের হকপন্থী হবার কথা ঘোষণা করতে পারলে তার দাওয়াত খুবই প্রভাবশালী ও কার্যকর হবে। সূরা হামীমুস সাজদার ৩২নং আয়াতে সর্বোত্তম দাওয়াতদানকারীর একটি পরিচয় বলা হয়েছে যে, সে নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করে দেয় 'ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমীন'।

এর ব্যাখ্যায় আবুল আ'লা মওদূদী রহ. বলেছেন : "এ কথার তাৎপর্য বুঝার জন্যে মক্কা মুয়াযযামার সেই পরিবেশকে সম্মুখে রাখতে হবে যা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি। নবূয়্যতের সে অধ্যায়ে কোনো ব্যক্তির এ ঘোষণা দেয়া যে

'আমি একজন মুসলমান' সহজ ও মামুলি ব্যাপার ছিলো না। বরং এটা ছিলো হিংস্র পশুদেরকে নিজের উপর হামলা করার আহ্বান জানানোর নামান্তর। বাস্ এখন সত্য দীনের দাওয়াতদানকারীর এ বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হলো যে, তিনি কেবলমাত্র পবিত্র আমলের অধিকারীই নন, বরং তিনি নিকৃষ্টতম শত্রুদের সম্মুখে এবং চরম বিরুদ্ধবাদী পরিবেশেও নিজের মুসলমান হবার কথা অস্বীকার করেন না, লুকিয়ে রাখেন না।

নিজের মুসলমান হবার কথা স্বীকার করতে এবং তার ঘোষণা দিতে কোনো লজ্জা, সংকোচ ও ভয়-ভীতির পরোয়া করেন না। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেন, হ্যাঁ, আমি মুসলমান, যার যা ইচ্ছা করুক।'

অন্য কথায় দীনে হকের দাওয়াতদানকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটাই হতে হবে যে, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও বাহাদুর ব্যক্তি হবেন।

আল্লাহর পথে ডাকা কোনো ভীরু কাপুরুষের কাজ নয়। সামান্য চোটেই যে ভেঙ্গে পড়ে, এমন ব্যক্তি কখনো মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারে না। ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকার যোগ্যতা রাখে, যে কঠিনতম শত্রুতার পরিবেশে, বিরুদ্ধতার পরিবেশে এবং মারাত্মক বিপজ্জনক পরিবেশে ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে দণ্ডায়মান হবার সৎসাহস রাখে এবং পরিণামের কোনো পরোয়াই করে না।

রসূল সা. স্বয়ং এরূপ বাহাদুরীর বাস্তব ও পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন। মক্কার ঘোরতর পরিবেশে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত পেশ করেছেন। সত্যের সাক্ষ্যের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেইসব লোকদের মধ্যেই এ আন্দোলনকে জারি রেখেছিলেন, যারা ছিলো তাঁর খুনের পিয়াসী এবং যারা অত্যাচার ও নির্যাতনে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেনি।" (খুতবাতে ইউরোপ : দায়ী ইলাল্লাহর গুণাবলী)।

৯. আমলে সালেহ

মহান আল্লাহ বলেন : • وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

"সে ব্যক্তির চাইতে ভালো কথা কে বলে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজেকে আমলে সালেহ দ্বারা সুশোভিত করে।" (সূরা ৪১ হামীমুস সাজদা : আয়াত ৩৩)

অর্থাৎ হক পথের দাওয়াতদানকারীকে আমলে সালেহর সৌন্দর্যে সুশোভিত হতে হবে। তাকে নেক আমল করতে হবে। একটু চিন্তা করলে এ ফরমানটার তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে দাওয়াতদানকারীর নিজের আমলই যদি দুরস্ত না হয়, তবে তার দাওয়াতের আর কোনো প্রভাবই থাকে না। তা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়।

একজন ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি লোকদের দাওয়াত দেবেন তার নিজেকেই প্রথমে সে জিনিসের প্রতিমূর্তি হতে হবে। তার নিজের জীবনে আল্লাহর নাফরমানীর এতোটুকু চিহ্নও যেনো পাওয়া না যায়।

তার নৈতিক চরিত্র এমন হতে হবে যেনো কোনো ব্যক্তি তার মধ্যে একটি দাগও খুঁজে না পায়। তার আশে-পাশের পরিবেশ, তার সমাজ, তার বন্ধু-বান্ধব, তার আপনজন ও আত্মীয়-স্বজন যেনো এ কথা মনে করে যে, আমাদের মধ্যে একজন উচ্চ ও পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তি রয়েছে।

১০. নিঃস্বার্থপরতা (ইখলাস)

দাওয়াতদানকারী শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং মানুষকে কল্যাণের পথে আনার নিয়্যতে দাওয়াতি কাজ করবেন। এর পেছনে যদি কোনো প্রকার পার্থিব চিন্তা বা স্বার্থ লুক্কায়িত থাকে তবে তার সমস্ত তৎপরতাই পণ্ড হয়ে যাবে।

দাওয়াতদানকারী যে মহাসত্যের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবেন তার সত্যতা মানুষ তখনই উপলব্ধি করবে, যখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াতি কাজ করবেন।

তার মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো পার্থিব স্বার্থ রয়েছে বলে যদি মানুষ উপলব্ধি করে, তবে কিছুতেই মানুষের উপর তার দাওয়াতের প্রভাব পড়বে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সা. দাওয়াতদানকালে মানুষকে সুস্পষ্টভাবে নিজের নিঃস্বার্থপরতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ •

"হে নবী তুমি বলে দাও : এ দাওয়াতের কাজের জন্যে তোমাদের কাছে তো আমি কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছি না। এতো হলো বিশ্ববাসীর জন্যে সাধারণ উপদেশ।" (সূরা ৬ আল আনআম, আয়াত : ৯০)।

১১. দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহর দিকে

দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহর দিকে, ইসলামে দাওয়াতদানকারী মানুষকে দাওয়াত দেবেন আল্লাহর দিকে, নিজের বা নিজের দলের দিকে নয়। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ •

"ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়?" (সূরা ৪১ হামীমুস সাজদা : আয়াত ৩৩)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসির তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে :

"একজন সত্যপথের দাওয়াতদানকারীর বৈশিষ্ট্য এটা যে : তার দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে। তার সামনে কোনো প্রকার পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবে না কোনো দেশীয়, বংশীয় কিংবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্যই তার মনের কোণে স্থান পেতে পারবে না। যে ব্যক্তি খালেছভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, কুরআন মজীদের শিক্ষা অনুযায়ী এমন আহ্বানকারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য এটাই হতে হবে যে, তিনি আল্লাহর একত্বের (তাওহীদের) প্রতি দাওয়াত দেবেন।

তাকে এভাবে আহ্বান করতে হবে : হে মানুষ! এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করবে না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না, তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু পাওয়ার লোভ ও কামনা করবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশ সমূহের আনুগত্য করো। কেবলমাত্র তাঁর বিধানেরই অনুসরণ করো।" (তাফহীমুল কুরআন)।

১২. পরকালের জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত করে দিতে হবে

ইসলামি আন্দোলন ও দাওয়াতি তৎপরতার মূল লক্ষ্যই হলো পরকালের মুক্তি। তাই, একজন দায়ী যখনই কাউকেও দীনের দাওয়াত দেবেন, তখন তার কাছে অবশ্যি এর মূল লক্ষ্য অর্থাৎ পরকালীন মুক্তির কথা তুলে ধরতে হবে। তুলে ধরতে হবে পরকালীন আযাবের বীভৎস রূপ। সুসংবাদ দিতে হবে সীমাহীন সুখ সম্ভোগের জান্নাতের।

আর দুনিয়ায় জীবন যাপনের পথ নির্ধারণের উপরই যে পরকালীন আযাব কিংবা জান্নাতের বিষয়টি নির্ভরশীল তাও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বুঝিয়ে দিতে হবে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করলেই কেবল পরকালে জান্নাত লাভ করা যাবে। আর তাঁর বিধান অমান্য করে চললে পরকালের অনন্ত জীবন হবে সীমাহীন আযাব, লাঞ্ছনা আর দুঃখের।

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ • وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا • فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ • وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ • فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

"দুনিয়ায় যে আল্লাহর বিরুদ্ধে গিয়েছিল আর পৃথিবীর জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল, দোযখই হবে তার আবাস। আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছিল আর প্রবৃত্তিকে মন্দ বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।" (সূরা ৭৯ আন নাযিয়াত : আয়াত ৩৭-৪১)

এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআনের আলোকে দাওয়াতি কাজের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো। কুরআনে এ কাজের আরো বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এছাড়া রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনেও রয়েছে এ কাজের অনেক বাস্তব উদাহরণ। আল্লাহর দিকে দাওয়াতদানকারীদের কুরআন ও সীরাতের আলোকে এ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য।

* * *

১১

মহান নেতার
জনতা ও জনপদ জয়ের অন্তরজয়ী শক্তি

এই বিশ্বে তরবারির জোরে অনেকেই ভূখণ্ডের মালিক হয়েছে। অনেক রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র অস্ত্র বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বার্থ সংক্রান্ত টানাপোড়নের অনেক ফায়সালা রণাঙ্গনে হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের যে কোনো বিপ্লবী আন্দোলনকে নিজের ভাগ্যের ফায়সালা সব সময় জনমতের ভিত্তিতেই করতে হয়।

মানুষের হৃদয় স্বতস্ফূর্তভাবে কোনো আদর্শের প্রতি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত না হলে এবং নিজেদের চরিত্র ও মানসিকতাকে তার আলোকে গড়ে তুলতে রাজি না হলে বলপ্রয়োগ করে সমর্থন আদায় করা লাভজনক হতে পারেনা। বরঞ্চ সেটা হয় মারাত্মক ধ্বংসের কারণ।

তাই প্রত্যেক আদর্শবাদী আন্দোলনের আসল প্রকৃতি ও মেজাজ হয়ে থাকে আহবান, আবেদন ও শিক্ষামূলক। আর তার পরিচালকদের মধ্যে সক্রিয় থাকে মুরুব্বি ও গুরুজনসুলভ স্নেহ মমতা ও প্রেরণা।

আদর্শবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিতে সমাজ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সব মানুষ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। এই ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে এবং দুর্বৃত্তদের সংশোধন এবং কু-প্রভাব থেকে সমাজের ভদ্র ও মধ্যমপন্থী লোকদের নিরাপদে রাখার জন্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও মাঝে মাঝে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সামগ্রিক পরিবেশ সব সময় ছাত্রদের জন্যে স্নেহ-মমতা ও করুণার পরিবেশ হয়ে থাকে এবং উস্তাদের শাসনও মুরুব্বিসুলভ মনোভাবই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে।

নবীগণের নীতি ছিলো, কেউ যদি নতুন জীবন লাভ করতে চায়, তবে সে যেনো তা যুক্তির মাধ্যমেই লাভ করে, আর যদি কেউ জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের জন্যে মৃত্যু পছন্দ করে, তবে সেও যেনো যুক্তির আলোকেই মৃত্যু বরণ করে।

রসূল সা. তাঁর মহান শিক্ষামূলক, প্রচারমূলক, গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে মোট তেইশ বছর সময় কাটিয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ছয় বছর ছিলো

এমন, যখন শিক্ষামূলক কাজের পাশাপাশি বিরোধীদের জংগি আক্রমণ ও আচরণের মোকাবিলাও করতে হয়েছে।

সর্বাধিক অতিরঞ্জিত করেও যদি অনুমান করা হয়, তবুও মনে হয়, সব ক'টা যুদ্ধে সর্বমোট পনের হাজারের চেয়ে বেশি লোক রসূল সা. এর মোকাবিলায় আসেনি এবং এসব যুদ্ধে মাত্র ৭৫৯ ব্যক্তি নিহত হবার মাধ্যমে আরবের কয়েক লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণরূপে শুধরে যায়।

দশ বছর ইতিহাসে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়। এতো অল্প সময়ে আরবের ন্যায় মরুভূমিকে মানুষের জীবনের সঠিক কল্যাণের লক্ষ্যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারী, চরম উচ্ছৃংখল, হিংস্র ও দাঙ্গাবাজ গোত্র ও ব্যক্তিবর্গকে এর আওতাভুক্ত করা, তারপর তাদেরকে সুমহান নৈতিক শিক্ষা দানে সাফল্য অর্জন করা এবং শুধু শিক্ষা দেয়া নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যে তাদেরকে শিক্ষক ও উস্তাদে পরিণত করা সম্ভবত রসূল সা.-এর নবুয়্যতের সবচেয়ে বড় বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক প্রমাণ।

সুতরাং ইসলামের আন্দোলনের সাথে জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘাতের নিষ্পত্তিতে মূলত জনমতের অবদানই ছিলো সর্বাধিক এবং জনমতের অংগনই ছিলো নিষ্পত্তির আসল অংগন। কিছুটা আধ্যাত্মিক ভাষায় যদি বলি তবে বলা যায়, মানুষের হৃদয় জয় করাই ছিলো রসূল সা.-এর আসল বিজয় ও আসল সাফল্য। আরবের লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে তিনি যদি জয় করে থাকেন, তবে তাদের হৃদয়ই জয় করেছেন এবং তা করেছেন যুক্তি ও চরিত্রের অস্ত্র দিয়ে।

দাওয়াত যদি সত্য ও সঠিক হয়, আন্দোলন যদি মানব কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং এর পতাকাবাহীরা যদি ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান হয়, তবে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ বিপ্লবী কাফেলার জন্যে অধিকতর সহায়ক হয়ে থাকে। এক একটা বাধা এক একটা পথ প্রদর্শক হয়ে আসে। এই জন্যেই যদিও সংখ্যালঘু দিয়েই সত্যের সূচনা হয়ে থাকে, কিন্তু তা সংখ্যাগুরুকে জয় করে থাকে। দেখা যাক, রসূল সা.-এর ইসলামি আন্দোলন কী কী শক্তি ব্যবহার করে জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা লাভে দ্রুত সাফল্য অর্জন করেছিল।

১. যুক্তি প্রমাণ ও জাগ্রত বিবেকের শক্তি

ইসলামি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলো যুক্তি প্রমাণের শক্তি। ইসলামি আন্দোলনের পরিবর্তে যদি রসূল সা. পীর মুরিদীর কোনো ব্যবস্থা

চালু করতেন, তাহলে শ্রোতাদের বিবেক বুদ্ধিকে অবশ করে দিতেন। প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ কোনো ধর্ম যদি প্রবর্তন করতেন, তাহলে অলীক কল্পনা ও ভিত্তিহীন ধ্যানধারণার প্রতি মানুষের ঝোঁক ও আগ্রহ বৃদ্ধি করতেন। বৈরাগ্যবাদী আধ্যাত্মিক দর্শন শিক্ষা দানের কোনো ব্যবস্থা যদি চালু করতেন, তাহলে তো চোখ কান ও মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতেন।

কিন্তু রসূল সা. যে ইসলামি আন্দোলন চালু করেন, তাতে এমন সচেতন জাগ্রত বিবেকের অধিকারী লোকদের প্রয়োজন ছিলো, যারা আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে পুরো একটা সভ্যতাকে গড়ে তুলতে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে। এজন্যেই ইসলামি আন্দোলন যখন শুধু দাওয়াত পর্যায়ে ছিলো, তখন সে মানুষের সুপ্ত বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুললো। মনমগজকে ঝাঁকুনি ও ধাক্কা দিয়ে সচকিত করে তুললো। চোখ খুলে দেখতে ও কান খুলে শুনতে উদ্বুদ্ধ করলো।

রসূল সা.-এর আন্দোলন লোকদেরকে বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে চিন্তাগবেষণা করতে উৎসাহ যোগালো। মানব সত্তার অভ্যন্তরের ও তার পারিপার্শ্বিক জগতের পরিস্থিতির সুক্ষ্ম পর্যালোচনা করার শিক্ষা দিলো। নিত্য নতুন প্রশ্ন তুলে চিন্তাধারাকে শানিত ও গতিশীল করে তুললো। অন্ধ অনুকরণের বন্ধন ছিন্ন করলো। অর্থহীন রসম রেওয়াজের বিলুপ্তি ঘটালো। অতীত পূজা ও পুরুষানুক্রমিক রীতি প্রথার অন্ধ আনুগত্য বাতিল করলো। পশুর মতো নির্বোধ মানুষের ভেতর থেকে বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ সৃষ্টির কৌশল উদ্ভাবন করলো। অন্ধ, বোবা ও বধির শ্রেণীর লোকদের ঠোকা দিয়ে দিয়ে সচেতন করে তুললো এবং বিবেকবুদ্ধির মরিচা দূর করে দিলো।

এক কথায়, তাঁর ইসলামি আন্দোলনের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হলো, তা মানুষের উপর জাহেলিয়াতের চাপিয়ে দেয়া বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার অবসান ঘটায়। এর ফলে যাদের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত ও সচেতন হয়, তাদের সামনে ইসলাম জীবনের মৌলিক সত্যগুলোকে পেশ করে, নিজের শানিত যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তাদের প্রভাবিত করে এবং প্রকৃত সত্যগুলোর প্রতি তাদের অটুট বিশ্বাস গড়ে তোলে।

ইসলামি আন্দোলন যখন একমাত্র আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, মালিক, জীবিকাদাতা, হুকুমদাতা, ও সুপথ প্রদর্শক হিসেবে পেশ করলো, তখন তার বলিষ্ঠ যুক্তির সামনে তার বিপরীত ভিত্তিহীন ও অলীক কল্পনার হাতিয়ারগুলো ভোতা ও অকার্যকর হয়ে গেলো।

তাঁর আন্দোলন মানুষের বিবেচনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে আহবান জানালো : তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর বিচিত্র সৃষ্টি, গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন, ঋতু ও আবহাওয়ার বিবর্তন, বৃষ্টি ও বাতাসের নিয়মবিধি, তরুলতার জন্ম ও বৃদ্ধির দৃশ্য, পশুপাখীর বংশবৃদ্ধি ও লালনপালন, মানবগোষ্ঠী সমূহের বৈচিত্র, সভ্যতা সমূহের উত্থান পতন এবং আপন সত্তার গভীরতা পর্যবেক্ষণ করো ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। দেখবে, সর্বত্র অটল আইন-কানুন চালু রয়েছে। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অংশে একটা সুষ্ঠু ও সুশৃংখল শাসন কার্যকর রয়েছে। ছোট কিংবা বড় প্রতিটি ঘটনার কোনো না কোনো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিণতি নির্দিষ্ট রয়েছে। বিচিত্র সব পরস্পর বিরোধী বস্তু পরস্পর সহযোগী ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলেছে। সমগ্র সৃষ্টির কারখানায় এক ধরনের সমন্বয় ও একাত্মতা বিরাজ করছে। একের মধ্যে বাধা রয়েছে অনেক। প্রতিটি জিনিস গতিশীলও বিকাশমান। কোথাও স্থবিরতা ও গতিহীনতা নেই। প্রতিটি বস্তু উৎকর্ষের দিকে ধাবমান। প্রতিটি উপকরণ ও কার্যকারণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্ম দিয়ে চলেছে। অত:পর প্রতিটি ফলাফল আবার আরেকটি ফলাফলের জন্যে উপকরণে পরিণত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক জগতের এই আইন, এই শৃংখলা, এই সমন্বয়, এই সহযোগিতা, এই ঐকতান এবং এই বিকাশ ও বিবর্তনের ধারা আপনা আপনি একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার ভিত্তিতে উদ্ভুত হয়নি। জিনিসগুলো নিজের পরিকল্পনা নিজে করেনা, নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনা এবং পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমেও পরস্পরকে সহযোগিতা করেনা। বরং সর্বোচ্চ, সদাসক্রিয়, স্বয়ম্ভু, সার্বভৌম, মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় স্রষ্টা আল্লাহই এগুলোর একমাত্র পরিচালক, ব্যবস্থাপক, শাসক ও আইন রচয়িতা হিসাবে কাজ করে চলেছেন। মহাবিশ্বের সকল শক্তি ও বস্তু তাঁরই গুণগানে নিয়োজিত। সকল বস্তু তাঁরই সামনে সাজদারত। সকল সৃষ্টি তাঁরই প্রাকৃতিক আইনের অনুগত। বিশালকায় সূর্য থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস তাঁরই দরবারে মাথা নুইয়ে রেখেছে।

ইসলাম এ কথাও বলেছে যে, এতো বড় সৃষ্টির এই বিশাল কারখানায় যদি একাধিক মালিক ও ব্যবস্থাপক থাকতো, তাহলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যেতো এবং যে পারস্পরিক সহযোগিতা, একাত্মতা ও ঐকতান তোমরা মহাবিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান দেখতে পাচ্ছো, তা কোনোক্রমেই কায়েম থাকতো না। বিশ্ব প্রকৃতির এই বিশাল পুস্তকের পাতায় পাতায় শুধু তাঁর অস্তিত্বের নয়, বরং সেই সাথে তাঁর একত্ব ও তাঁর গুণাবলীর অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ খোদাই করা রয়েছে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র সা.

আন্দোলনের মৌলিক দাওয়াত সমস্ত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ সহকারে কুরআনে সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। চমৎকার বর্ণনা ভঙ্গিতে একে বারবার পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে বিরোধীদের আপত্তি, ব্যাংগবিদ্রূপ ও উপহাসেরও জবাব দেয়া হয়েছে শান্তশিষ্ট ও স্বাভাবিক ভাষায়।

তারপরও কোথাও উপদেশ দেয়া হয়েছে, কোথাও সতর্ক করা হয়েছে, কোথাও হুমকি দেয়া হয়েছে, কোথাও লজ্জা দেয়া হয়েছে, কোথাও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, কোথাও কোমলতা ও নম্রতা দ্বারা মানুষের মনকে গলিয়ে দেয়া হয়েছে। মোটকথা বিভিন্ন ভংগিতে মানুষের মনমগজকে এমনভাবে ঘিরে ফেলা হয়েছে যে, বিবেকবুদ্ধির অধিকারী সচেতন লোকদের জন্যে পালানোর কোনো পথই রাখা হয়নি। যুক্তিপ্রমাণ পেশ করার উপর এতোটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল যে, কুরআনের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি জায়গা জুড়ে এর অবস্থান।

সত্য কথা হলো, ইসলামি আন্দোলনের ক্ষুরধার যুক্তির সামনে শ্রোতাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। যারা ভাগ্যবান, তারা একে খোলা মনে গ্রহণ করেছে। আর যারা বুদ্ধির বক্রতার কারণে গ্রহণ করেনি, তারা যুক্তির প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে হিংস্র প্রতিরোধে নামে। যে আন্দোলন শ্রোতাদেরকে এই পর্যায়ে পৌছে দেয়, সে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জয়লাভ না করে ছাড়েনা।

২. দরদী ও হিতাকাংখী সুলভ আবেদনের (approach) শক্তি

কুরআনের যুক্তিগুলো শুধু যুক্তি নয়, সাথে সাথে মন গলিয়ে দেয়া, পলায়নপর লোকদের আকৃষ্ট করে কাছে ডেকে আনা এবং বদ্ধ হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেয়ার আবেদনও তাতে রয়েছে। ইসলামি আন্দোলনের এ জাতীয় আবেদন পাষাণ হৃদয় মানুষকেও মোমের মতো গলিয়ে দিতো। কুরআন খুললেই দেখা যাবে তার প্রতিটি বাক্যে কিভাবে যুক্তির আলোর সাথে সাথে আবেগের উষ্ণতা মিশ্রিত রয়েছে। এ জন্যেই তো ইসলামের বড় বড় পাষাণ হৃদয় শত্রুও সত্যের সেবকে পরিণত হয়েছে।

যারা বিরোধিতার ফ্রন্ট খুলে বসেছিল, তাদেরও সর্বোত্তম অনুভূতির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। মুশরিক হোক বা আহলে কিতাব, প্রত্যেক গোষ্ঠীর উত্তম মানুষদের উত্তম ভংগিতে আহ্বান জানানো হয় এবং তাদের সর্বোত্তম ভাবাবেগকে সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়।

কুরআন যে কতো শক্তিশালী গ্রন্থ এবং সত্যের দাওয়াত যে কতো প্রতাপশালী তা কুরআনের যে কোনো সমঝদার পাঠকই আঁচ করতে

পারেন। সত্যের এই তীব্র আলোকরশ্মি যখন একের পর এক নাযিল হয়েছে, তখন মধ্যপন্থী মানুষের পক্ষে চিন্তা ও কর্মের অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরে থাকা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। যুক্তির সাথে আবেগময় আবেদন যখন মিলিত হয় তখন এই শক্তির সম্মিলনে এমন দোধারী তলোয়ার তৈরি হয়, যা পাথরও কেটে ফেলতে পারে।

তাছাড়া কুরআনের পাশাপাশি রসূল সা. এর বাণীগুলোও ভাষণ বা বৈঠকি বক্তব্যের আকারে অনবরতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এসব বাণী হাদিস গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত হয়েছে। ছোট ছোট বাক্যে এতো ব্যাপক তাৎপর্যবহ, প্রভাবশালী ও প্রাণাকর্ষী বক্তব্য পৃথিবীতে আর কোনো ব্যক্তি দিতে পারেনি। মোটকথা, সত্যের বাণীই ছিলো আসল অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যার সামনে বাতিলের টিকে থাকার সাধ্যই ছিলনা।

৩. সমালোচনার শক্তি

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র দাওয়াত যুক্তির সাথে কেবল আবেদনেরই সমাবেশ ঘটায়নি, বরং আবেদনের সাথে সাথে তীব্র সমালোচনাও করেছে। সুফীবাদী মতাদর্শে তো দাওয়াতের একটাই পদ্ধতি চলে। অর্থাৎ অনুরোধ, আবেদন, তোষামোদ ও মিনতি করার পদ্ধতি। সুফীবাদী মতাদর্শ ও ব্যক্তিমুখী ধর্মগুলিতে শুধুমাত্র এতোটুকু লক্ষ্য রাখা হয় যে, সেখানে শিষ্যদেরকে কিছু আকীদা বিশ্বাস ও কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলী শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদেরকে অপশক্তি থেকে আত্মরক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়। কিন্তু সংঘবদ্ধ সামষ্টিক অপশক্তি ও দুস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং বিকৃত পরিবেশের সাথে টক্কর দেয়ার কোনো প্রেরণা তাদের মধ্যে জন্মেনা।

কিন্তু যে মতাদর্শ সভ্যতার বিপ্লব সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়, তার বাহকদের চিন্তার কারখানায় যুক্তি ও আবেদনের মতো সমালোচনাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সত্যের প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, বরং বাতিলের বিলুপ্তি সাধনও জরুরি। কেননা বাতিলের বিলুপ্তি ছাড়া সত্যের প্রতিষ্ঠাও পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠেনা। এখানে আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা পরস্পর নির্ভরশীল। একটা না করে অপরটা করা যায়না। পাশাপাশি অসৎকাজ প্রতিহত না করলে সৎকাজের আদেশ দেয়া ফলপ্রসূ হয়না। এখানে 'ইল্লাল্লাহ্' বলবার আগে 'লা-ইলাহা' বলতেই হয়।

রসূলুল্লাহ্র দাওয়াতি মিশনের সূচনা থেকেই জনগণের চিন্তাধারা পাল্টে দেয়ার জন্যে প্রচলিত সভ্যতা সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশেষত প্রচলিত চিন্তাধারা, আকিদা বিশ্বাস ও

মূল্যবোধের কঠোর সমালোচনা করা হয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আধিপত্যশীল শ্রেণীগুলো, যারা জনগণকে নিজেদের দাসত্বের জালে আবদ্ধ করে আয়েশি জীবন কাটায়, তাদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়। সামষ্টিক জীবনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যাদের হাতে নিবদ্ধ, সাধারণ জনতার কাছে তাদের আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয়া হয়। অন্যায়কে অন্যায়, বাতিলকে বাতিল এবং ভুলকে ভুল বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

জাহেলি সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও ইতিহাসে নতুন স্বর্ণালী অধ্যায়ের উদ্বোধন কল্পে যখন রসূল সা.-এর মাধ্যমে আরবে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটলো, তখন সে সর্বপ্রকারের মিথ্যা, যুলুম ও অসততার নির্মম সমালোচনা করলো। তৎকালে যতো রকমের লোক জাহেলি সমাজব্যবস্থা ও তাগুতি পরিবেশের রক্ষক, সমর্থক ও সহযোগী হয়ে সমাজের উপর চেপে বসেছিল এবং যারা নিজেদের মর্যাদা ও কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্যে মানব জাতির কল্যাণ বিধানকারী এই দাওয়াতের কণ্ঠরোধ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, ইসলাম অভাবনীয় দু:সাহসিকতার সাথে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল এবং তাদের চমকপ্রদ পোশাকে আবৃত অপকর্মগুলোকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তুলে ধরেছিল। এভাবে মানবতা বিরোধী বাতিল শক্তির আসল পরিচয় সমাজের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে এবং জনমনে সচেতনতা বিস্তার লাভ করতে থাকে। আর সেই সাথে পরিবর্তনের আকংখাও তীব্রতর হতে থাকে। এই সমালোচনা জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু চিন্তা, স্বচ্ছ উপলব্ধি, নিরপেক্ষ যাচাই-বাছাই, তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের যোগ্যতা সৃষ্টি ও বিকশিত করে।

আন্দোলন তার প্রধান আহ্বায়কের পবিত্র যবানেই প্রথম এই তিক্ত দায়িত্ব পালন করেছে। অহির ভাষার অস্ত্র দিয়েই সমাজের রোগাক্রান্ত অংগে অপারেশন চালিয়েছে। এই সমালোচনা শুধু আদর্শ ও মূলনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রতিরোধরত প্রভাবশালী শক্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ-সবই এর আওতায় এসেছে। এই সমালোচনা দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটেই করা হতো এবং শত্রু পক্ষের কৃত কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনাও সাথে সাথেই করা হতো। এভাবেই গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানবতার মুক্তিদূত রসূল সা. কুরআনের ভাষায় সমালোচনা করে সমকালীন সমাজপতিদেরকে শুধু যে যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়ে দেউলিয়া প্রমাণ করেছেন তা নয়, বরং জগতবাসীর সামনে এটাও ফাঁস করে দিয়েছেন যে, বড় বড় পদ মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ

অত্যন্ত নোংরা ও ঘৃণ্য চরিত্র নিয়ে সমাজের উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমালোচনার ফলেই জনগণ বুঝতে পেরেছে, ইসলামি আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করে এই সব ঘৃণ্য অপশক্তিকে সক্রিয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ না করা পর্যন্ত জনজীবনে সৌন্দর্য, শৃংখলা ও সৌষ্ঠব ফিরে আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

মূলত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. যুক্তি, আবেদন ও সমালোচনা- এই তিন ধরনের উপকরণকে কাজে লাগিয়েছেন এবং তেইশ বছর ধরে অবিরাম কাজে লাগিয়েছেন। এই তিনটি শক্তিই বিরোধীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তারা যুক্তির দিক দিয়ে দুর্বল, উদ্দেশ্যের প্রতি আবেগ সৃষ্টিতে পশ্চাদপদ এবং চরিত্রের দিক দিয়ে খুবই নিম্নস্তরের।

এ কারণে বিরোধীদের মধ্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি এবং নিজেদের হীনতার অনুভূতি অবচেতনভাবে বেড়ে উঠে। অপর দিকে জনগণও উভয় পক্ষকে সর্বদিক দিয়ে যাচাই বাছাই করে উভয়ের পার্থক্য বুঝতে পারে।

ইসলামি আন্দোলনের আসল শক্তি ছিলো এটাই এবং এটাই আরবের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মন জয় করেছিল।

ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলন যদি সত্য কেন্দ্রিক না হতো, জনগণের মনকে আকৃষ্ট করতে না পারতো, আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদেরকে হক ও বাতিলের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারতো এবং যুক্তি, আবেদন ও সমালোচনা দ্বারা নিজের শক্তি ও পরাক্রমের স্বীকৃতি আদায় করতে না পারতো, তাহলে মুসলমানরা রাজনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রেও জয়লাভ করতে পারতোনা, রণাঙ্গনেও বিজয় অর্জন করতে পারতোনা। এ সব ময়দানেও যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা এ জন্যেই হয়েছে যে, জনমতের বিশাল অঙ্গনে ইসলামের অগ্রযাত্রা ছিলো শানিত ও বিজয়মুখী।

৪. চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি

যে কোনো দাওয়াত, যদি শুধু শাব্দিক দাওয়াত হয় এবং তার সাথে নৈতিক শক্তির সমন্বয় না থাকে, তবে তা যতোই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন এবং সাময়িকভাবে যতোই যাদুকরি প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা ধূঁয়ার কুণ্ডলির মতো বাতাসে মিলিয়ে যায়। ইতিহাসের উপর কেবল কথা দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা যায়না। শুধু কথা দিয়ে কোনো কালেই কোনো বিপ্লব সাধিত হয়নি। কথা দ্বারা তখনই কিছু প্রভাব সৃষ্টি হয়, যখন কাজের মাধ্যমে তার কিছু অর্থ নির্ণিত হয়। ভাষার যাদু সাবানের মতো সুদর্শন

ফেনা ও রংগীন বুদবুদ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এই সব বুদবুদ মাটির একটা কণাকেও তার জায়গা থেকে সরাতে সক্ষম হয়না, বরং তা সংগে সংগেই বিলীন হয়ে যায়।

যুক্তি যখন আচরণ ছাড়াই আসে, আবেদন যখন আন্তরিকতাহীন হয় এবং সমালোচনা যখন নৈতিক দিক দিয়ে শূন্যগর্ভ হয়, তখন তা মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়না। নৈতিক শক্তিই কোনো আন্দোলনকে প্রভাশালী করে। কর্মের সাক্ষ্য ছাড়া মুখের সাক্ষ্য নিষ্ফল হয়ে থাকে।

রসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত নিছক তাত্ত্বিক বা যুক্তি ভিত্তিক দাওয়াত ছিলনা। তাঁর দাওয়াত ছিলো পুরোপুরি কর্মের আহবান। এ দাওয়াত এক বিশেষ ধরনের নতুন মানুষ তৈরি করার জন্যে এসেছিল। প্রথম দিন থেকেই সে তার এই ঈপ্সিত মানুষ তৈরির কাজ শুরু করেছিল। জ্যান্ত যুক্তি, জ্যান্ত আবেদন ও জ্যান্ত সমালোচনার কোনো জবাব জাহেলিয়াতের হাতে ছিলনা। তাদের যুক্তির কাছে জাহেলিয়াত ছিলো একেবারে অসহায়।

এরা ছিলেন সেই নতুন মানুষ, যাদের পূর্ণাংগ নমুনা ছিলেন স্বয়ং রসূল সা. এবং যাদের প্রেরণায় আরো বহু মানুষ তৈরি হচ্ছিল। তারা ছিলেন বাস্তব ও অকাট্য সত্য মানব দল। সে সত্যের সামনে চোখ বন্ধ করে রাখাও তার আলোরই তীব্রতার প্রমাণ বহন করতো। যারা এ সত্যকে অস্বীকার করতো, প্রত্যাখ্যান করতো এবং তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো, তারাও তাদের আচরণ দ্বারা এর শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষণা করেছিল।

রসূল সা. এই নতুন মানুষ তৈরির আসল কাজ থেকে কখনো উদাসীন হননি। অন্যদের সংশোধনের উৎসাহে ইসলাম এ কাজকে ভুলে যায়নি। অন্যদের সংশোধনের চেয়ে আত্মশুদ্ধির গুরুত্বই এখানে বেশি ছিলো। অন্যের সমালোচনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো আত্মসমালোচনা। বাইরে পরিবর্তন আনার আগে তার কাছে নিজের ভেতরে পরিবর্তন আনা ছিলো অধিকতর জরুরি।

রসূল সা. একদল সৎ শুদ্ধ ও সুসভ্য মানুষকে সাথে নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তাঁর এই দলটা প্রথম দিন থেকেই সমাজে খুব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল এবং সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। মানবতার এই নতুন নমুনাগুলোকে লোকেরা অবাক হয়ে দেখতো এবং তাদেরকে সমাজের অন্য সবার থেকে সর্বদিক দিয়েই ভিন্নতর ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বোধ করতো। এই দলটির আবির্ভাব ও বিকাশ বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তাদের সামনেই হয়েছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জনগণ খুব ভালোভাবেই দেখেছে। সর্বশ্রেণীর মানুষ

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দেখতো, ইসলামের বাণী একের পর এক ভালো ভালো লোকদের আকৃষ্ট করে চলেছে। সহসা এক একজন মানুষ নিজের বিবেকের চাপে বাধ্য হয়ে এই বদলে যাওয়াদের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। যে ব্যক্তি কয়েকদিন আগেও মুহাম্মদ সা. এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করেছে, সে সহসাই মাথা নত করে দিয়েছে, যেনো কেউ তাকে যাদু করেছে।

যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে তৎক্ষণাৎ শুভ পরিবর্তন শুরু হয়। তার বন্ধুতা ও শত্রুতা পাল্টে যায়। তার আদত অভ্যাস ও রুচিতে বিপ্লব এসে যায়। তার ব্যস্ততা ভিন্নরূপ ধারণ করে। ইতিপূর্বে যে সব বিষয়ে তার আগ্রহ ছিলো, সেগুলো পাল্টে গিয়ে নতুন বিষয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। আর সে সাথেই সে অত্যন্ত সক্রিয় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

তার মধ্যে একটা নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটে। তার সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা জেগে ওঠে। তার বিবেক নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়। তার মধ্যে উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে। যে ব্যক্তি কাফির থেকে মুসলমান হতো, তার ভেতর থেকে যেনো একেবারেই নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটতো। সে নিজেও অনুভব করতো, আমি পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম এবং নতুন। পরিবেশও তাকে দেখে অনুভব করতো, সে পাল্টে গেছে।

খুনী সন্ত্রাসী ইসলাম গ্রহণ করে জীবনের রক্ষক হয়ে যেতো। চোর ইসলাম গ্রহণ করে আমানতদারে পরিণত হতো, ব্যাভিচারী ইসলাম গ্রহণ করে নারীদের সম্ভ্রমের রক্ষকে পরিণত হতো। ডাকাত ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি ও সমঝোতার মূর্ত প্রতীক হয়ে যেতো। বদমেজাজী ও বক্র স্বভাবের লোক ইসলামের ছায়াতলে এসে সহনশীল বিনয়ী ও অমায়িক মানুষ হয়ে যেতো। সুদখোর এসে দানশীল হয়ে যেতো। নির্বোধ ও মেধাহীন লোক এসে উচ্চ প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতো। নিম্ন সামাজিক স্তর থেকে এসে মহত্ত্বের উচ্চ স্তরে উন্নীত হতো, যেনো সে অন্য কোনো জগতের প্রাণী। মনে হতো যেনো মাটি দিয়ে তৈরি নয় বরং অন্য কোনো উপাদানে গঠিত।

রসূল সা. এবং তাঁর সাথিরা ছিলেন আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত, সত্যের একনিষ্ঠ সেবক, সৎকাজের উদ্যোক্তা, কল্যাণের আহ্বায়ক, অন্যায় ও অসত্যের দুশমন, যুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, রাতের বেলায় আল্লাহর সাথে একনিষ্ঠ সংলাপে নিয়োজিত, মিসকীনদের খাদ্য দানকারী, পথিকের আতিথেয়তাকারী, এতীম ও বিধবার সেবক, আড্ডাবাজী ও অবৈধ খেলাধুলা থেকে সংযম অবলম্বনকারী, বিলাসিতা ও

আমোদ ফূর্তি থেকে আত্মরক্ষাকারী, বেহুদা তর্ক বিতর্ক থেকে সংযত, গাম্ভীর্য ও আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত, পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতীক, জনারণ্যে একাকী এবং আপন জনপদে প্রবাসী–এ সব অসাধারণ গুণবৈশিষ্টের অধিকারী সমগ্র আরবের মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত না হয়ে পারেন কিভাবে?

এই মহান চরিত্র প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, তা কিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই চরিত্রের শিক্ষক নিজে বধ্যভূমি থেকে বিদায় হবার সময় নিজের হত্যাকারীদের গচ্ছিত আমানত ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন। এই চরিত্র লাভকারীরা ব্যভিচারের অপরাধ সংঘটিত করার পর উপযাচক হয়ে অপরাধের স্বীকারোক্তি করেছে এবং ইসলামি আদালতের কাছ থেকে নিজের জন্যে মৃত্যুদণ্ড আদায় করে ছেড়েছে, যাতে করে তারা আল্লাহর কাছে পবিত্র অবস্থায় উপস্থিত হতে পারে। এই চরিত্রকে ইসলাম গ্রহণের কয়েক মিনিট পরই যখন জনৈক সুন্দরী যুবতী তার প্রমোদ সংগি হবার আহ্বান জানিয়েছেন তখন সে এই বলে ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হতে পারিনা।

মহান নেতার সাথিদের মধ্যে কী ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে, তাও সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে। তারা দেখেছে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মনমগজে বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে মেধার বিকাশ ঘটে চলেছে। সারা আরব অবাক হয়ে দেখছে, তাদের মধ্যে কেউ আইনশাস্ত্রে, কেউ কৃষিতে, কেউ ব্যবসায় বাণিজ্যে, কেউ যুদ্ধ বিদ্যায়, কেউ প্রশাসনে, কেউ কূটনীতিতে, মোটকথা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে নতুন ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য চলেনা। এই চরিত্রের দৃঢ়তা এতো বেশি ছিলো যে, তা ইরানের জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতা দেখেও প্রভাবিত হয়নি এবং রোমের বিলাসবহুল জীবন দেখেও হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়নি। মুসলমানরা বড় বড় রাজ দরবারে নিজেদের বেদুঈন সুলভ চালচলন নিয়েই মূল্যবান কার্পেট পদদলিত করে মাথা না ঝুঁকিয়েই হাজির হয়েছে। পূর্ণ সাহসিকতার সাথে নিজ বক্তব্য পেশ করেছে।

এই চরিত্রকে যখন মানসিকভাবে পুরোপুরি মজবুত ও স্থিতিশীল করা হয়েছে এবং সব ধরনের হীনমন্যতার উর্ধে তুলে দেয়া হয়েছে, তখন রণাঙ্গণেও তারা বীরত্ব ও দৃঢ়তার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ববাসী অবাক

হয়ে দেখেছে, এ চরিত্র সংখ্যায় কম ও সাজসরঞ্জামে অপ্রতুল হলেও তাকে ধ্বংস করা এবং তার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত আরবের কোণে কোণে নবগঠিত মুসলিম সমাজের আশ্চর্য হাল হাকিকত নিয়ে আলোচনা চলতো। আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে কথাবার্তা হতো। মোটকথা, দু'জন মানুষ একত্রিত হলেই মহাম্মদ সা.,ইসলামি সমাজ, ইসলামি আন্দোলন ও মদিনার সরকারের সুকীর্তি ও সুখ্যাতিই হতো প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ইসলামি আন্দোলনের এই নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তিই তার যুক্তি ও আবেদনকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করেছে। এটা ছিলো মুসলিম চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের গণস্বীকৃতি এবং এই গণ-স্বীকৃতিই সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামের অনুগত বানিয়ে দিয়েছে। ইসলামের দুর্বার আকর্ষণ চারদিকের জনমানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

৫. সমঝোতা ও সন্ধি চুক্তির শক্তি

মহান নেতা রসূলুল্লাহ সা. জনগণের মধ্যে দাওয়াতের যে ব্যাপক কাজ উপরোক্ত প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেন, তার সাথে আরো কিছু বড় বড় সহায়ক পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিলো মদিনায় রাজনৈতিক প্রভাব সম্প্রসারণ। এই প্রভাব সম্প্রসারণের কাজটা অনেকাংশে সমাধান করা হয় চুক্তি ও মৈত্রী সম্পর্কের মাধ্যমে। চুক্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে রসূল সা. তাঁর সরকারের প্রভাব বলয় সম্প্রসারণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর অস্বাভাবিক মনোযোগ প্রদান থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যতোদূর সম্ভব, যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন এবং চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছিলেন, যাতে করে এ ধরনের শান্ত পরিবেশে ভালোভাবে দাওয়াতের কাজ করা যায় এবং সামরিক উত্তেজনা মাঝখানে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

যেখানে ইসলাম, ইসলামি রাষ্ট্র ও শান্তি রক্ষার জন্যে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে, সেখানে তো তিনি কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেননি। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যদি সম্ভব হতো এবং শান্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ, স্থিতিশীলতা ইসলামের দাওয়াত দেয়ার বাধাহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হতো, তাহলে তিনি সন্ধি ও সমঝোতার পথ কখনো পরিহার করেননি। রসূল সা. রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও তার প্রভাব সম্প্রসারণের জন্যে মিত্রতার সম্পর্ককে এতো ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন যে, তার তুলনায় সামরিক ব্যবস্থার অনুপাত ছিলো নিতান্তই নগণ্য।

চুক্তি ও মৈত্রী ভিত্তিক সম্পর্ক গড়া সহজ কাজ নয়। বিশেষত, ধর্মীয় মতভেদ ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ যেখানে বিদ্যমান থাকে, পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলো মাঝখানে হস্তক্ষেপ করে এবং ব্যাপারটা যদি সাধারণভাবে একেবারেই পূর্ব পরিচয়বিহীন গোত্র ও ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত হয়, সেক্ষেত্রে এ কাজে অত্যধিক রাজনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে রসূল সা. যে উন্নত পর্যায়ের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, নেতাসুলভ দক্ষতা ও কূটনৈতিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তার নজীর কোথাও পাওয়া যায়না। নজীর পাওয়া যায়না এ জন্যে যে, রসূল সা. সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে ইসলামি আদর্শের, নিজের নৈতিক মূলনীতির এবং নিজের রাজনৈতিক মর্যাদার এক বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি হতে দেননি।

রসূল সা. ডিপ্লোমেসি ও রাজনীতির অর্থ একেবারেই পাল্টে দিয়েছেন। এ কাজ দুটোকে তিনি শুধু নোংরামি থেকেই মুক্ত ও পবিত্র করেননি, বরং তাতে সততা ও ইবাদতের প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছেন।

আসুন, এই মূল তত্ত্বকে মনে রেখে রসূল সা. এর প্রতিষ্ঠিত সুদূর প্রসারী চুক্তি ভিত্তিক সম্পর্কগুলোর পর্যালোচনা করি। এ সম্পর্কগুলো তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো অত্যন্ত প্রতিকূল।

০১. আকাবার চুক্তি : চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় আকাবার চুক্তির কথা। এ চুক্তি একাধারে ধর্মীয় অঙ্গিকার এবং রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞাও। আকাবার প্রথম বৈঠকে রসূল সা. -এর হাতে হাত দিয়ে মদিনার একদল টগবগে যুবক রসূল সা. -এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার স্বীকৃতি দেয়। দ্বিতীয় বৈঠকে রসূল সা. -এর রাজনৈতিক নেতৃত্বের আনুগত্যের ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

মক্কা থেকে মিনা যাওয়ার পথে রাস্তার দু'দিকে পাহাড়ের সমান্তরাল উঁচু প্রাচীর অবস্থিত। মিনা থেকে এক ফার্লং আগে বাম দিকের পাহাড়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা ছোট উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে আকাবার চুক্তি সংঘটিত হয়।

মদিনায় ইহুদিদের উপস্থিতির কারণে আনসাররা কিতাব এবং নবুয়্যতের ধারাক্রমের সাথে মোটামুটি পরিচিত ছিলো। প্রতিশ্রুত শেষ নবী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের জানা ছিলো। ইহুদিরা যে তাদেরকে বিভিন্ন সময় ভয় দেখাতো, "সেই প্রতিশ্রুত শেষ নবী এলে আমরা তাঁকে সাথে নিয়ে তোমাদের পরাভূত করবো", এ কথাও তাদের মনে ছিলো। এভাবে

আনসারদের মধ্যে একদিকে যেমন আসমানি হিদায়াতের চাহিদা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, অপরদিকে অবচেতনভাবে এই আবেগও জন্মে গিয়েছিল যে, প্রতিশ্রুত সেই নবী এলে আমরাই সর্ব প্রথম তার প্রতি ঈমান আনবো।

রসূল সা. -এর সাথে যখন তারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হলো, এবং রসূল সা. -এর দাওয়াত শোনার সুযোগ পেলো, অমনি তাদের মন এ দাওয়াত গ্রহণের জন্যে উৎসুক ও উদগ্রীব হয়ে উঠলো। আলোচনায় তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। রসূল সা. -এর সুদর্শন চেহারা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁর দাওয়াতি বক্তব্যের সাথে যুক্ত হয়ে সেই মানসিক বিপ্লবকে চূড়ান্ত রূপ দিলো, যার জন্যে আনসারদের মনমগজ আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলো।

সেই মুহূর্তটা ছিলো একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন কতিপয় আনসার (প্রথম বায়য়াতের সময়) কুরাইশদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাদের ইচ্ছাটা পাল্টে যায়। তারা কুরাইশদের চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে মক্কার সেই উদীয়মান সূর্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়, যে সূর্য ইতিহাসের উদয়াচল থেকে নতুন আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে দিগন্ত উদ্ভাসিত করছিল।

প্রথম বারের বায়াতে রসূল সা. কয়েকটি আকিদাগত ও নৈতিক বিষয়ে অংগীকার গ্রহণ করেন। তারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরিক করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, সন্তানদের হত্যা করবেনা, কারো বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ আরোপ করবেনা এবং সৎকাজের ব্যাপারে রসূল সা. -এর আদেশ অমান্য করবেনা- এই মর্মে তিনি তাদের অংগীকার গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বায়াতে আনসারগণ যে ক'টা কথা সংযোজন করেন তা হলো : "আমরা সর্বাবস্থায় রসূল সা. এর আদেশ শুনবো ও আনুগত্য করবো, চাই পরিস্থিতি অনুকূল হোক কিংবা বিপদ সংকুল, কোনো আদেশ আমাদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ, অথবা কোনো আদেশ আমাদের মতের বিরুদ্ধে যাক। আমরা আমাদের নেতার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হবোনা এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবোনা।

এই সংক্ষিপ্ত অংগিকারের মাধ্যমে মুহাম্মদ সা. ও আনসারদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো এবং খোলাখুলিভাবে এই দল একটা রাজনৈতিক দলে পরিণত হলো। রসূলের সা. নেতৃত্বকে তারা সর্বতোভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করলো। তারা এই মর্মেও প্রতিজ্ঞা করলো যে, নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ও পদমর্যাদাকে ছিনিয়ে নেয়ার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা।

পরামর্শের মূলনীতি এরূপ স্থির হয়ে গেলো যে, প্রত্যেক বিষয়ে যা সঠিক ও ন্যায়সংগত, তাই উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ব্যাপারে অংগিকার করা হলো যে, আমাদের ওপর যে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হবে, তা সারা দুনিয়ার নিন্দা সমালোচনাকে উপেক্ষা করেও বাস্তবায়িত করবো।

এই বিষয়গুলোর সাথে সাথে আরো স্থির হয় যে, রসূল সা. মদিনায় হিজরত করার পর চুক্তিবদ্ধ আনসারগণ রসূল সা. কে ঠিক এমনিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যেভাবে তারা আপন স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, মদিনার ইসলামি দলের সাথে রসূল সা. এর প্রতিরক্ষামূলক ঐক্যের চুক্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এদিক দিয়ে আকাবার চুক্তির রাজনৈতিক মূল্য আরো বেড়ে গিয়ে 'বিপ্লবী' হয়ে যায়।

এরপর রসূল সা. এর নির্দেশে মদিনার আনসারদের ইসলামি সংগঠনের পক্ষ থেকে বারোজন প্রতিনিধি বা নকিব নিযুক্ত করা হয়, যারা রসূল সা. এর কাছে দায়ী থাকবে। ইসলামি দাওয়াতের বিস্তার ও সম্প্রসারণ ছাড়াও রাজনৈতিক দায়িত্বও তাদের ওপর অর্পণ করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকরের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল সা. এই নকীবগণকে বলেন, "তোমরা তোমাদের জনগণ সম্পর্কে ঠিক সেইভাবে দায়িত্বশীল থাকবে, যেমন ঈসা আ.-এর সামনে তার সংগি হাওয়ারীগণ দায়িত্বশীল ছিলো। আর আমিও আমার জনগোষ্ঠী অর্থাৎ মক্কাবাসী সম্পর্কে দায়িত্বশীল।

নকীবদের নিযুক্তির পর মদিনার যে প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি হয়, তা শুধু ধর্মীয় ছিলনা, বরং তা হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক এবং বিপ্লবীও। এ ধরনের অবকাঠামোর স্বতস্ফূর্ত ও স্বভাবসুলভ দাবি তো এই ছিলো যে, তা যেনো যতো শীঘ্র সম্ভব, বরং প্রথম সুযোগেই রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

বাস্তবেও হলো তাই, রসূল সা. এর হিজরতের কয়েক মাস পরই মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এ থেকে বুঝা গেলো, ইসলামি আন্দোলন প্রাথমিক দাওয়াতের যুগ পূর্ণ করে রাষ্ট্রীয় যুগে প্রবেশ করেছিল চুক্তিরই মাধ্যমে, বল প্রয়োগ বা সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়।

২. হুদাইবিয়ার সন্ধি : রসূল সা. পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি এমন একটা ঘটনা, যার ফলে ঘটনাপ্রবাহে সূচিত হয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এ ঘটনার ফলে ইসলামি আন্দোলন এক লাফে সার্বজনীনতার পর্যায়ে সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পায়। এই ঘটনা

দ্বারা রসূল সা. এর সর্বোচ্চ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নিকৃষ্টতম ও যুদ্ধরত শত্রুকে তিনি কতো সহজে সমঝোতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নির্বাসিত ইহুদিরা যখন খয়বর, তায়মা ও ওয়াদিউল কুরাতে গিয়ে নিজেদের আখড়া গড়ে তুললো, তখন মদিনা এক সাথে দুই শত্রুর মুখে উপনীত হলো। খন্দক যুদ্ধ থেকে ভালোয় ভালোয় উত্তীর্ণ হবার পর রসূল সা. এর সামনে যে জটিল সমস্যা দেখা দেয়, তা হলোঃ কুরাইশ ও ইহুদি এই দুই শত্রুর ঐক্যকে কিভাবে ভাঙ্গা যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে মক্কার দিকে আক্রমণ চালাতে গেলে খয়বরের ইহুদিরা ও বনু গাতফান মদিনায় হামলা চালিয়ে বসতে পারে। আর যদি খয়বরের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়, তাহলে কুরাইশ আক্রমণ চালিয়ে বসতে পারে। রসূল সা. অত্যন্ত নির্ভুলভাবে অনুমান করতে সক্ষম হন যে, এ দুই শত্রুর মধ্যে খয়বরের ইহুদি আখড়াই এক আঘাতে তছনছ করে দেয়া যায়। আর সেই সাথেই মক্কার কুরাইয়শদেরকে সহজেই সন্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। আসলেই কুরাইশের শক্তি ভেতর থেকে খোখ্লা হয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে তারা যতোই হাকডাক দিক, প্রতিরোধের ক্ষমতা তেমন একটা তাদের ছিলনা।

তাছাড়া মক্কা ও তার আশেপাশে রসূল সা. এর কিছু সমর্থকও ছিলো। তাঁর কিছু কিছু পদক্ষেপ এই সমর্থকদেরকে আরো চাঙ্গা করে তুলেছিল। রসূল সা. দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে মক্কায় খাদ্যশস্য ও নগদ অর্থ পাঠিয়ে সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

ওদিকে একটা বড় রকমের সমস্যা এও ছিলো যে, মুসলমানরা প্রায় ছয় বছর যাবত মক্কা ছেড়ে এসেছে। ব্যাপারটা শুধু জন্মভূমির প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইবরাহিম আ. এর দাওয়াতের কেন্দ্র কা'বা শরিফের সাথেও জড়িত। মুসলমানরা এই ইবরাহিমী দাওয়াতেরই নবায়ন করছে। কাজেই তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে, চিরদিনের জন্যে এই আদর্শিক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। কুরাইশ এখনও পর্যন্ত মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেনা এবং দৃশ্যত, এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিলো। এ কারণে মুসলমানদের ভাবাবেগ ক্রমেই অস্থির ও উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ইসলামি জামাতের অধিকার যে হারাম শরিফের উপর রয়েছে, সে কথা প্রকাশ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

ইতোমধ্যে রসূল সা. স্বপ্নে হজ্জ করার ইংগিত পেলেন। এই ইংগিত পাওয়া মাত্রই তিনি তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা বলে সর্বোত্তম সময়ে সর্বোত্তম কর্মসূচি

গ্রহণ করলেন এবং সর্বোত্তম উপায়ে তার বাস্তবায়ন করলেন। তিনি একটা বিরাট দল সাথে নিয়ে হজ্জের পবিত্র মাসে ওমরা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যারা যেতে চেয়েছিল, কেবল তাদেরকেই তিনি সাথে নিলেন। এ ধরনের চৌদ্দশত মুসলমান তাঁর সঙ্গি হলো। তিনি নুমায়লা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসীকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসকের দায়িত্ব দিয়ে মদিনা হেফাজতের উদ্দেশ্যে রেখে গেলেন। কুরবানীর সত্তরটি উট সাথে নিলেন। কোনো সমরাস্ত্র নেয়া হলোনা। অত্যন্ত নীরবে যাত্রা শুরু হলো। যুল হুলায়ফাতে পৌছে কুরবানীর জন্তুগুলোকে চিহ্নিত করা হলো।

এই সফর একদিকে ধর্মীয় সফর ছিলো। অপর দিকে এতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিকও আপনা থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ধর্ম ও রাজনীতির এই সমন্বয় ও সমাবেশ আমরা রসূল সা. এর গোটা জীবনেতিহাসেই বিদ্যমান দেখতে পাই। তাছাড়া হজ্জের সফরে পার্থিব কর্মকাণ্ড বা রাজনৈতিক তৎপরতাকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণ বৈধ। তাই কুরাইশদের জন্যে এই হজ্জ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিলো। হারাম শরিফের এই অভিযাত্রীদেরকে যদি ঠেকানো না হয় তাহলে তার অর্থ হবে, মুসলমানদের জন্যে মক্কা চিরতরে উন্মুক্ত হয়ে গেলো।

অপরদিকে নগরবাসীর মনে রসূল সা. ও তাঁর সাথিদের হারাম শরিফে আগমনের খুবই গভীর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিলো। ইসলামি বিপ্লবের এই আহ্বায়কদের আগমনে মক্কাবাসীদের মনে রসূলের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হতো। জনগণও বলাবলি করতো যে, কুরাইশদের সেই দোর্দন্ড প্রতাপ শেষ হলো। পরবর্তী সময় সন্ধি চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় মক্কার প্রতিনিধি সোহায়েল বিন আমরের বক্তব্য থেকেও এটা পরিষ্ফুট হয়ে গেছে। সে বলেছিল, আমরা যদি আপনাদেরকে কা'বা শরিফে ঢুকতে দেই, তাহলে সমগ্র আরববাসী বলবে, আমরা আপনাদের শক্তির ভয়ে পথ খুলে দিয়েছি।

রসূল সা. পথিমধ্যেই সব কথা জেনে জান। বশীর বিন সুফিয়ান নামক জনৈক খুজায়ী গোয়েন্দা উসফান নামক স্থানে এসে জানায়, কুরাইশ প্রতিরোধের আয়োজন করবে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, মুহাম্মদকে কখনো মক্কায় প্রবেশ করতে দেবেনা। তাঁকে বাধা দেয়ার জন্যে খালেদ একদল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কুরাউল গামমি পর্যন্ত এসেছে। একথা শুনে রসূল সা. বললেন: "এ হচ্ছে কুরাইশদের দুর্ভাগ্য। ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা যদি মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াতো এবং আমাকে সমগ্র আরববাসীর সাথে বোঝাপড়া করতে একলা ছেড়ে

দিতো, তাহলে তাদের কী অসুবিধা ছিলো? আরবরা যদি আমাকে খতম করে দিতো, তাহলে তাদের আশাই পূরণ হতো। আর যদি আমি জয় লাভ করতাম, তাহলে তারা ইচ্ছা করলে সবাইকে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো। তারা যদি আমাকে এ সুযোগ না দেয়, তাহলে আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে যে মহাসত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা দিয়ে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাবো, হয় এই মহাসত্য বিজয়ী হবে, নচেত আমার মাথা কাটা যাবে।" কুরাইশ পুরানো জিদ ও হঠকারিতার বশে দ্রুতগতিতে মিত্র গোত্রগুলোকে বালদাহ নামক স্থানে সমবেত করলো।

সংগে সংগে দূতিয়ালী তৎপরতা শুরু হয়ে গেলো। সর্বপ্রথম খুযায়া গোত্রের সরদার বুদাইল বিন ওয়ারাকা (যিনি ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন) কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাথি নিয়ে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। রসূল সা. তাকে জানালেন, "আমরা শুধু কা'বা শরিফ যিয়ারত করতে এসেছি। যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কুরাইশরা যুদ্ধের নেশায় মত্ত। অথচ যুদ্ধে তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হবেনা। কয়েক বছরের জন্যে কুরাইশ যদি আমাদের সাথে সন্ধি করে তবে ক্ষতি কী?" এভাবে রসূল সা. তাঁর আসল বক্তব্য শুরুতেই তুলে ধরলেন।

বুদাইল গিয়ে কুরাইশদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, তোমরা তাড়াহুড়ো করোনা। মুহাম্মদ যুদ্ধ করতে আসেননি, নিছক যিয়ারতের জন্যে এসেছেন। বদমেজাজী যুবকরা তো কোনো কথাই শুনতে রাযী ছিলনা। তবে বয়স্ক লোকেরা সব কথা শুনলো। তারপর তারা আহাবীশ নেতা উলাইস বিন আলকামাকে পাঠালো। সে যখন কুরবানীর জন্তুর পাল মাঠে বিচরণ করতে দেখলো, তখন তার ভাবান্তর ঘটলো। সে কুরাইশদের কাছে গিয়ে খোলাখুলি বললো, এসব তীর্থযাত্রীকে বাধা দেয়া ঠিক নয়। আমরাও এ উদ্দেশ্যে আসিনি। আহাবীশ নেতাকে এই বলে শান্ত করা হলো যে, অন্তত আমাদের শর্তগুলো মানিয়ে নেয়ার সুযোগ দাও।

এরপর কুরাইশ উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে প্রতিনিধি করে পাঠালো। উরওয়া এসে বললো "হে মুহাম্মদ! আপনি যদি নিজেরই গোত্রের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেন, তবে সেটা কোনো প্রশংসনীয় কাজ হবেনা। আপনি যে সব বখাটে লোকদের একত্রিত করে নিয়ে এসেছেন, তারা কয়েক দিন পর সটকান দিলে আপনি একাকী হয়ে পড়বেন। এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক রা. রেগে গেলেন এবং কিছুটা কঠোর ভাষায় উরওয়াকে ধমক দিলেন। আরবদের প্রচলিত নিয়মে অন্তরঙ্গ ভংগিতে কথা বলতে বলতে

যখনই উরওয়া রসূল সা. এর দাড়ির কাছে হাত নিয়ে যাচ্ছিল, অমনি প্রতিবার মুগীরা ইবনে শুবা তরবারির ছুচাঁলো অংশ দিয়ে তার হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। রসূল সা. উরওয়ার সামনেও নিজের বক্তব্য তুলে ধরলেন। উরওয়া এখানে যে পরিবেশ দেখলো, তাতে গভীরভাবে অভিভূত হয়ে ফিরে যায়। ফিরে গিয়ে সে বলে, "নেতার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের যে দৃশ্য আমি দেখেছি, তা কোনো রাজা বাদশাহর দরবারেও দেখিনি। মুহাম্মদের সাথিরা তার জন্যে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। তার ইশারায় তারা মরতে প্রস্তুত। তাঁর সামনে কেউ উঁচু স্বরে কথা বলেনা।"

উরওয়ার এই প্রতিক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, দল কর্তৃক নেতার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য পোষণই ইসলামি আন্দোলনের শক্তির অন্যতম উৎস। ভালোবাসা ও আনুগত্য মিলিত হয়ে দুর্জয় শক্তির জন্ম দেয়। কোনো দলের ভেতরে এ ধরনের পরিবেশ থাকলে তা বিরোধীদেরকে দুর্বল ও আতংকগ্রস্ত করে দেয়। এখানে নিছক কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবেশ বিরাজ করে না যে, একে অপরের যুক্তি খণ্ডনের কাজে লেগে থাকে। সভাপতিও সদস্যদের প্রতি কোনো আন্তরিক সম্পর্ক পোষণ করেনা, সদস্যরাও বোধ করেনা সভাপতির প্রতি কোনো হৃদয়ের টান। কেবল সংবিধান ও নিয়মবিধির বাহ্যিক আনুগত্য করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়।

নেতার বিরুদ্ধে বিষোদগার, গীবত, নিন্দা, কানাঘুষা ও নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র চলে যে সব দলে, সেখানে কেমন নোংরা পরিবেশ বিরাজ করে, ভাবতেও অরুচি বোধ হয়। ইসলামি সংগঠনের ভেতরকার পরিবেশ হিতকামনা, আনুগত্য, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার পরিবেশ। এখানে প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব থাকে। তবে নেতা সবার জন্যে ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কেননা তা নাহলে পরস্পরের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসার পরিবেশ যেমন সৃষ্টি হয়না, তেমনি ইসলামি সংগঠন ইস্পাত কঠিন প্রাচীরেও পরিণত হয় না। তাই এ দৃশ্য উরওয়ার মনকে অভিভূত করে আর এই প্রতিক্রিয়াই সে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে ব্যক্ত করেছিল।

আলাপ আলোচনার এই ধারাকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে রসূল সা. খারাশ ইবনে উমাইয়াকে কুরাইশের কাছে পাঠালেন। মক্কায় অরাজক ও উচ্ছৃংখল পরিবেশ এমনিতেই বিদ্যমান ছিলো। রসূল-এর যে উটে চড়ে খারাশ মক্কায় গিয়েছিল, উচ্ছৃংখল লোকেরা সেই উটটাকে মেরে ফেললো। সে নিজেও অতি কষ্টে জান বাঁচিয়ে ফিরে এলো।

এরপর উসমান রা. কে পাঠানো হলো। উচ্ছৃংখল লোকদের একটা দল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে বেরিয়েছিল। তারা মুসলমানদের যত্রতত্র

উস্কানি দিল এবং তীর ও পাথর ছুঁড়ে মারলো। মোট কথা, কুরাইশদের যুদ্ধংদেহী লোকেরা কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধ বাধাতে সচেষ্ট ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ "উভয় পক্ষের হাতকে সংযত রাখলেন।"

ফলে শান্তির পরিবেশটা অক্ষুণ্ন থাকলো এবং শান্তি রক্ষার চেষ্টা জয়ী হলো। উসমান রা. কে কুরাইশরা আটকে রাখলো এবং তাঁর ফিরে আসতে খুব দেরি হয়ে গেলো। অশুভ ও অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর কারণে পরিবেশ এমন ছিলো যে গুজব রটে গেলো, ওসমান রা. কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।

রসূল সা. সংগে সংগে মুসলমানদের সমবেত করলেন এবং প্রয়োজনে আমরণ লড়াই করার অংগীকার গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "ঘটনা সত্য হলে আমরা এদের সাথে লড়াই না করে ঘরে ফিরবোনা।" উসমানের জীবন সেদিন অত্যধিক মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। কেননা রসূল সা. এর ভাষায় পরিস্থিতি ছিলো এ রকম যে, "উসমান আল্লাহ্ ও তার রসূলের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গেছে।"

তিনি নিজের এক হাতকে উসমান রা. -এর হাত বলে আখ্যায়িত করে তার ওপর নিজের পক্ষ থেকে অন্য হাত রেখে বললেন, "অংগীকার করো।" তাঁর সাথিরা এমনিতেই আবেগে অধীর ছিলেন। তারা আন্তরিকতার সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে বায়াত ও অংগীকার করতে লাগলেন।

এই আকস্মিক মুহূর্তটা ঈমান বৃদ্ধি ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত মুহূর্ত ছিলো এবং এ সময় মুসলমানরা নিজেদেরকে এতো উচ্চ মানে উন্নীত করেন যে, রসূল সা. বলেন, "আজকের দিন তোমরা সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এই মুহূর্তের ঈমানী জযবা ও আন্তরিকতার দরুন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেন। শুধু একজন মোনাফিক জিফ বিন কায়েস এই মুহূর্তের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো। সত্যের সৈনিকদের জীবনে এরূপ মুহূর্ত আসে এবং নিষ্ঠাবান লোকদের আত্মা তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। চৌদ্দশো মুসলমান আমরণ লড়াই এর এই প্রতিজ্ঞার পুরস্কার এক ফোঁটাও রক্ত না ঝরিয়ে তৎক্ষণিকভাবে পেয়ে গেলেন।

কুরাইশরা খবর পেয়ে তৎক্ষণাত ওসমানকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। মক্কা থেকে মেকরায বিন হাফ্স এলো। রসূল সা. মানুষ চেনায় কতো দক্ষ ছিলেন দেখুন। দূর থেকে দেখেই বলে দিলেন।"ঐ যে এক ধাপ্পাবাজ আসছে।" অর্থাৎ তিনি জানিয়ে দিলেন, ঐ লোক দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কোনো কিছুর মীমাংসা সম্ভব হবেনা। অবশেষে কুরাইশরা সোহায়েল বিন আমরকে পাঠালো। তাকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, তারা সন্ধির জন্যে প্রস্তুত

হয়ে গেছে। শর্ত নিয়ে জরুরি কথাবার্তা হলো। অবশেষে চুক্তি লেখার জন্যে আলীর রা. ডাক পড়লো।

এমন নাজুক মুহূর্তে চুক্তি লেখা হচ্ছিল যে, কথার উত্তেজনা সৃষ্টির উপক্রম হয়। চুক্তির শুরুতে যখন রসূল সা. "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লেখার নির্দেশ দিলেন, তখন সোহায়েল বললো, "রহমান রহীম" আবার কী? আমাদের নিয়ম অনুসারে শুধু "বিছমিকা আল্লাহুমা" (হে আল্লাহ তোমার নামে) লেখা হোক। রসূল সা. তাদের দাবি মেনে নিলেন।

এরপর বললেন, লেখো, "এই চুক্তি আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ ও সুহায়েল বিন আমরের মধ্যে সম্পাদিত হলো।" সোহায়েল আপত্তি তুলে বললো, আমি যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল মানতাম, তাহলে আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম নাকি? আপনি শুধু নিজের নাম ও নিজের বাপের নাম লিখান।

আলী রা. "আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ" লিখে ফেলেছেন। এখন 'আল্লাহর রসূল" শব্দটা কেটে দেয়া তার কাছে মারাত্মক বেয়াদবি হবে ভেবে কাটতে পারলেন না। রসূল সা. কাগজটা নিয়ে নিজের হাতে ঐ কথাটা কেটে দিলেন এবং তার পরিবর্তে 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ' লেখে দিলেন।

সোহায়েলের এই সব ধৃষ্টতা দেখে রসূল সা. এর সাথিরা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু রসূল সা. এর সম্মানার্থে সংযম অবলম্বন করছিলেন। এবার নিম্মোক্ত শর্তাবলী লেখা হতে লাগলো :

- উভয় পক্ষ দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধি মেনে চলবে।
- মুসলিমরা এ বছর ফিরে যাবে এবং আগামি বছর উমরা করতে আসবে।
- তখন কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে মাত্র তিনদিন হারাম শরিফে কাটাবে।
- আরব গোত্রগুলো দুপক্ষের যার সাথে ইচ্ছা মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে।
- কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা মদিনার সীমানা অতিক্রম করার সময় পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে।
- কুরাইশদের কেউ যদি বিনা অনুমতিতে মদিনা চলে যায়, তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। কোনো মুসলিম মক্কায় এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবেনা।

শেষোক্ত শর্তটা মুসলমানদের মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতার সৃষ্টি করলো। পুরো মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝা যাবে, মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিলো।

তাদের কেবল এই সোজাসুজি ফর্মূলাটাই জানা ছিলো যে, আল্লাহর বাণীই ঊর্ধ্বে থাকা উচিত, আর কাফেরদের কথা থাকা উচিত নিচে। হক ও

বাতিলের মধ্যে আপোসের অবকাশ থাকতে পারে, তা তাদের জানা ছিলো না। আসলে আদর্শকে যদি নিছক তাত্ত্বিক ও দার্শনিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তাকে যদি বাস্তবতার জগতে নিয়ে এসে তা নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে সময়, সুযোগ এবং সপক্ষ ও বিপক্ষ শক্তিগুলোর অবস্থার আলোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। চোখ বুঁজে একই গতিতে সোজা পথে চলতেই থাকবেন এটা সম্ভব হয় না।

কোথাও থামতে হয়, কোথাও দুকদম ঘুরে যেতে হয় এবং কোথাও নতুন রাস্তা খোঁজার জন্যে দুকদম পিছিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন ধরনের শত্রুকে পর্যায়ক্রমে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে এক এক সময় তাদের এক একজনের সাথে সাময়িকভাবে আপোস করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই ব্যাপক বাস্তব তথ্য কেবল রসূল সা. এর সামনেই দৃশ্যমান ছিলো, মুসলিম সংগঠনের দৃষ্টি এতদূর পৌঁছতে সক্ষম ছিলো না।

তদুপরি তাদের সামনে যখন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং 'রসূলুল্লাহ' শব্দগুলো কেটে দেয়া হলো, তখন তাদের আবেগে ঝড়তুফান সৃষ্টি না হয়ে পারেনি। উপরন্তু যখন সেই অসম ও অবিচারমূলক শর্ত আরোপ করা হলো, তখন তাদের ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখা কঠিন হয়ে গেলো। রসূল সা. এই চুক্তি দ্বারা যে বড় বড় সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন, তা কুরাইশরা জানতোনা, মুসলমানরাও বুঝতে পারেনি। সমস্যা দেখা দেয় এই যে, ঠিক এই জটিল পরিস্থিতিতেই কুরাইশ প্রতিনিধি সোহায়েলের ছেলে আবু জানদাল শেকল পরা অবস্থায় মক্কা থেকে এসে হাজির হলো। তাকে মারপিট ও নির্যাতন করা হয়েছিল। সে রসূল সা. ও সাহাবিদের সামনে নিজেকে পেশ করলো। সোহায়েল বিন আমর বললো, প্রস্তাবিত শর্ত অনুসারে আবু জানদাল প্রথম ব্যক্তি, যাকে আপনার ফেরত পাঠাতে হবে। রসূল সা. বললেন, এখনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। কাজেই আবু জানদালের ব্যাপারটা এর আওতার বাইরে থাকতে দাও। সোহায়েল বললো, তাহলে কোন আপোস হতে পারে না।

এরপর রসূল সা. কোমল ভাষায় বুঝিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, ওকে আমার খাতিরে আমার সাথে মদিনায় যেতে দাও।" সোহায়েল মানলোনা। বাধ্য হয়ে রসূল সা. বৃহত্তর স্বার্থে এই অন্যায় আব্দার মেনে নিলেন। এবার আবু জানদাল সমবেত মুসলমানদের সম্বোধন করে বললো, "মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা আমাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাচ্ছো। অথচ ওরা আমাকে ঈমান থেকে ফেরানোর জন্যে আমার ওপর নির্যাতন চালাবে।"

আবু জানদালের এ আবেদন ঐ পরিবেশে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কিন্তু রসূল সা. তখন অতুলনীয় ঠাণ্ডা মেজাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। আবু জানদালকে নম্র ভাষায় বুঝালেন, "আমরা চুক্তিতে একটা কথা স্বীকার করে নিয়েছি। এখন চুক্তি ভঙ্গ করতে পারিনা। মযলুমদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা একটা মুক্তির পথ বের করবেন। একটু ধৈর্য ধারণ করো।"

মুসলমানদের অস্থিরতা ও উত্তেজনা ক্রমেই চরম আকার ধারণ করছিল। মুসলমানদের সবার মনে যেটুকু কুরাইশ বিরোধী উত্তেজনা সঞ্চিত ছিলো, তার সবটুকু বোধহয় একা উমরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে তাঁকে দিশেহারা করে তুলছিল। এটা ওমরের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ব্যাপার ছিলনা। সত্যের প্রতি দরদ ও ইসলামি আত্মাভিমানই তাঁকে অস্থির করে তুলছিল। এই অস্থিরতা নিয়েই তিনি প্রথমে আবু বকরের সাথে এবং পরে রসূল সা. এর সাথে নিম্নরূপ আলোচনা করেন :

উমর রা. : হে রসূলুল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রসূল নন?

রসূলুল্লাহ সা. : অবশ্যই। আমি আল্লাহর রসূল।

উমর রা. : তাহলে আমরা কি মুসলমান নই?

রসূলুল্লাহ সা. : কেন নও?

উমর রা. : তবে তারা কি মুশরিক নয়?

রসূলুল্লাহ সা. : কেন নয়?

উমর রা. : তাহলে আমরা ইসলামের ব্যাপারে নতজানু চুক্তি করবো কেন?

রসূলুল্লাহ সা. : আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি তাঁর কোনো হুকুম অমান্য করিনি। তিনি আমাকে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।

উমর এই পর্যায়ে চুপ হয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ভাবাবেগ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শান্ত হলোনা। চুক্তি লেখা হলো এবং তাতে উমর সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিয়ে আনুগত্যের এক অবিস্মরণীয় নজীর স্থাপন করলেন। শর্তগুলোর ব্যাপারে মন সন্তুষ্ট না হলেও রসূলুল্লাহ সা. যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না- এই মনোভাবটাই তিনি তুলে ধরলেন স্বাক্ষর দেয়ার মাধ্যমে।

হুদাইবিয়ার এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রসূল সা. সাহাবিদের কুরবানি করতে ও মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন। কিন্তু অস্থিরতা, দু:খ ও বেদনার কারণে কেউ নড়াচড়াই করলোনা। দ্বিতীয়বার নির্দেশ দিলেন। তাতেও কাজ হলোনা। তৃতীয়বার নির্দেশ দিলেন। তখনও

সেই অবস্থাই বহাল রইল। এ থেকেই বুঝে নেয়া যায় যে, স্বয়ং রসূল সা. এর হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দলটির মধ্যে কী ধরনের মানসিক সংকট ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মানবীয় তৎপরতার ক্ষেত্রে কতো বিচিত্র রকমের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তাও এই ঘটনা থেকে জানা যায়।

এ অবস্থা দেখে রসূল সা. মর্মাহত হয়ে নিজ তাবুতে চলে এলেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমার কাছে অনুযোগ করলেন, লোকদের কী হলো যে, আমি যে হুকুম দিলাম, তা কার্যকর হলোনা। উম্মে সালমা রা. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : চুক্তির শর্তপালনে তারা মর্মাহত। আপনি বাইরে বেরিয়ে নিজের কুরবানী করুন ও চুল কামিয়ে নিন।' রসূল সা. উঠে বাইরে গিয়ে কুরবানি করলেন ও চুল কামিয়ে নিলেন। এই বাস্তব পদক্ষেপ পুরো জামাতকে আনুগত্যের উপর বহাল করে দিলো। মহান নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. চুক্তি দ্বারা বড় বড় কয়েকটা সুবিধা লাভ করলেন।

প্রথমত: মুসলমান, মুশরিক ও সাধারণ আরবদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেলো। লোকদের মক্কা মদিনায় আসা যাওয়া শুরু হলো। বহু বছর যাবত যে সব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাত ছিলনা, তারা একত্রে উঠাবসার সুযোগ পেলো।

মক্কায় রসূল সা. ও মুসলমানদের সম্পর্কে মুশরিকরা যে সব বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল, মুসলমানরা তা জানবার ও দূর করার সুযোগ পেতে লাগলো। তারা মানুষের প্রশ্নের জবার দিতে লাগলো। নিজেদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও জ্ঞানগত উন্নতির বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার সুযোগ পেতে লাগলো। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ঘরে ঘরে খোলামেলা আলোচনা হতে লাগলো।

সন্ধি পরবর্তী এই শান্তির সময়টাতে ইসলাম এতো দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করলো যে, বিগত আঠারো উনিশ বছরে সামগ্রিকভাবে যতো লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, হুদাইবিয়ার সন্ধির পরবর্তী মাত্র দু'বছরেই তার চেয়ে অনেক বেশি লোক স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করছে। এমনকি খালেদ ইবনে অলিদ ও আমর ইবনুল আসের ন্যায় কর্মবীর যুবকরাও এই সন্ধির পরই ইসলামি দলের অন্তর্ভুক্ত হন। দ্বিতীয় যে সুবিধাটা অর্জিত হয়েছিল তা হলো, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক সংশোধন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজ সমাধান করার

জন্যে একাগ্রতা অর্জিত হলো। অভ্যন্তরীণ অংগনে নিরাপত্তা লাভের পর বিদেশী সরকারগুলোকে দাওয়াত দেয়ারও সুযোগ পাওয়া গেলো।

তৃতীয় সুবিধা পাওয়া গেলো এই যে, মদিনার সরকার খয়বরের ইহুদি বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কুরাইশের দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে গেলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরই ইসলামি সরকার এই সমস্যার সমাধান করে ফেলতে সক্ষম হলো।

চতুর্থ সুবিধা অর্জিত হলো এই যে, আরবের সবগুলো গোত্র স্বাধীন হয়ে গেলো। যে গোত্রের ইচ্ছা হবে, মদিনার সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে পারবে। এটা ছিলো এমন একটা নব উন্মুক্ত দরজা যে, এর মধ্য দিয়ে বহু নতুন লোক ইসলামের অভ্যন্তরে প্রবেশ অথবা মুসলমানদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে পারতো। অথচ কুরাইশরা তাতে কোনো বাধা দিতে সক্ষম ছিলো না। বনু খুযায়া গোত্র এই সুযোগেই ইসলামি সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এটাও চতুর্থ সুবিধারই আওতাভুক্ত যে, মাত্র এক বছর পর অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুসলমানরা মক্কায় গিয়ে কা'বা যিয়ারত করে এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তা ছিলো পরিপূর্ণ নির্ভীকতার পরিবেশ।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, কুরাইশের মতো কট্টর দুশমনদের সন্ধিতে উদ্বুদ্ধ করাটাই ছিলো রসূল সা. এর রাজনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মো'জেযা।

অপরদিকে ইসলাম এতো বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করবে, এমনকি খোদ মক্কা শহরে তার এতো প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে যে, কুরাইশদের শক্তি বর্তমান মানের চেয়ে নিচে নেমে যাবে, সেটাই বা কে অনুমান করতে পেরেছিল? আসলে এই চুক্তি ইসলামকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মক্কা জয় করার বিপ্লবী ক্ষমতা যুগিয়েছিল।

চুক্তি শেষে মদিনায় ফেরার সময় পথিমধ্যে সূরা আল ফাতাহ নাযিল হয়। তাতে অতীতের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের সুযোগ সুবিধার আভাস দিয়ে মুসলমানদের আল্লাহ সুসংবাদ দেন যে, তোমরা অচিরেই এমন একটা যুদ্ধে জয় লাভ করবে (খয়বরের যুদ্ধ), যাতে তোমাদের হাতে অনেক গনিমতের সম্পদ আসবে, তারপর তোমাদের এমন এক অভাবনীয়

সাফল্য ও বিজয় অর্জিত হবে, যা এতদিন ছিলো সম্পূর্ণরূপে তোমাদের আয়ত্ত্বের বাইরে।

এতে আরো বলা হয়, যদিও মক্কার মুশরিকদেরকে তোমরা আজও পরাজিত করতে সক্ষম এবং তারা অবশ্যই পালিয়ে যেতো, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বহু নরনারী রয়েছে, যারা কুরাইশদের অজান্তেই ইসলামকে মেনে নিয়েছে এবং তারা মনে মনে তোমাদের সমর্থক। এখন যুদ্ধ বেধে গেলে তারা বাধ্য হয়ে তোমাদের মোকাবিলায় আসতো এবং তোমরা তাদেরকে চিনতে না পারার কারণে আঘাত করতে। সুতরাং এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিলো যে, তিনি দুই পক্ষকে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করেছেন।

মানবীয় সংগঠনের সদস্যদের মেজাযের এই বৈচিত্র্য সংগঠনকে একটা বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও ভারসাম্য দান করে। এর এক প্রান্তে থাকে সিদ্দীকী গাম্ভীর্য আর অপর প্রান্তে থাকে ফারুকী তেজস্বিতা ও কঠোরতা।

এই হলো সেই ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি, যা ফলাফলের দিক থেকে ছিলো একটা মহাবিজয়। এই চুক্তি করতে কুরাইশকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ সংক্রান্ত সব কটা জটিল স্তর অতিক্রম করা ছিলো রসূল সা.-এর অসাধারণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও নেতাসুলভ প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। এ থেকে মুসলমানরাও কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে থাকবে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রসূলুল্লাহ সা.-এর সার্বিক জীবনাদর্শ, কর্মনীতি, কর্মকৌশল, নেতৃত্ব দানের দূরদর্শিতা, মানব দরদী ও উদার চিন্তাধারা যেভাবে মানুষের হৃদয় ও জনমতকে জয় করেছিল, তা কিছুতেই তরবারি দিয়ে কিংবা শক্তির জোরে জয় করা সম্ভব ছিলোনা।[৭]

* * *

৭. এ অনুচ্ছেদটি লেখা হয়েছে নঈম সিদ্দিকীর মুহসিনে ইনসানিয়াত গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের আলোকে।

১২

বাংলাদেশে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

১. রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ ও বাংলাদেশ

১,৪৮,০০০ বর্গ কিলোমিটারের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। ১৬ কোটি মানুষ অধ্যুষিত এই দেশের শতকরা প্রায় ৯০ জনই মুসলিম। এদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত সুগভীর ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকেই ইসলাম প্রচারকগণ এ অঞ্চলে আসতে শুরু করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের হাতে নিপীড়িত এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যখন ইসলামের সুবিচারমূলক শান্তির আহ্বান পেলেন তখন তারা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসে সমবেত হতে থাকেন। দ্বাদশ শতাব্দি থেকে এদেশে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রসূলুল্লাহর আদর্শের ভিত্তিতে এখানে কখনো সত্যিকারের ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মাঝখানে দেড়/দু'শ বছর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনে থাকলেও ১৯৪৭ থেকে এদেশের শাসন আবার মুসলমানদের হাতেই আসে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুসলমানরা স্বাধীন স্বতন্ত্র মানচিত্রের অধিকারী হয়। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়েও এখানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঘরের পাশেই পৌত্তলিক কালচারের অবস্থান। তাই প্রথম থেকেই পৌত্তলিক সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে এদেশে ইসলামের একটা সংঘাত চলেই আসছিল।

এ অঞ্চলের মানুষ ইসলামের দাওয়াত পেয়ে তা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ মুসলমানই কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। ফলে সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা আর পৌত্তলিক সংস্কৃতির প্রভাব এ দুই মিলে এখানকার সাধারণ মুসলমান রসুলুল্লাহর আদর্শ তথা খাঁটি ইসলামের পরিচয় লাভ থেকে দূরে থেকে যায়।

তাইতো দেখা যায়, মুসলিম হয়েও কেউ শিরকে নিমজ্জিত, কেউ নাস্তিকতায় নিমজ্জিত, কেউ খৃস্টানদের অনুকরণ পছন্দ করে, কেউ ভালোবাসে

ব্রাহ্মণ্যবাদী কালচার। ফলে এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রসূলুল্লাহর আদর্শ সত্যিকার অর্থে এবং পুর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই। অথচ মুমিন জীবনের সবচে' বড় অঙ্গীকার তো হওয়া উচিত ছিলো রসূলুল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠার।

২. রসূলুল্লাহর আদর্শ বলতে কী বুঝায়?

বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে কেবল তাঁরই দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কিভাবে মানুষ তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা জানবে, কিভাবে মানুষ জানবে তাঁর হুকুম ও বিধান, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। সে ব্যবস্থার নাম হচ্ছে নবুয়্যত ও রিসালাত। মানুষের মধ্য থেকেই কিছু লোককে তিনি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নবী নিযুক্ত করেন। অহির মাধ্যমে তাঁদের কাছে মানুষের জন্য পথনির্দেশ পাঠান।

নবুয়্যতের এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.। কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য তিনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামই তাঁর আদর্শ। ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলাম অকাট্য বিধান ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর পুরো জীবনে ইসলামের সমগ্র বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে বিশ্ব মানুষের সামনে ইসলামের আদর্শ পেশ করে গেছেন।

এখানে রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ বলতে ইসলামকেই বুঝানো হয়েছে। ইসলাম দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত : ১. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন। ২. রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ।

রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবন ছিলো আল্লাহর কিতাবের বাস্তব রূপায়ণ। তাঁকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের শিক্ষক নিয়োগ করেন। শিক্ষক হিসেবে এ কিতাবের ব্যাখ্যা দানের দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করেন।

রসূলুল্লাহ সা. একদিকে কিতাবের মৌখিক শিক্ষা প্রদান করেন, অপর দিকে প্রদান করেন বাস্তব শিক্ষা। অর্থাৎ তিনি নিজের জীবনকে কিতাবের শিক্ষা

অনুযায়ী গড়ে তোলেন এবং নিজেকে মানুষের সামনে কিতাবের বাস্তব সাক্ষ্য ও নমুনা হিসেবে পেশ করেন।

সুতরাং কুরআন ছাড়াও কুরআনের বাহক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, যেভাবে ইসলামের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন, জীবনের প্রতিটি দিক যেভাবে পরিচালনা করেছেন এবং রসূল হিসেবে প্রচলিত সমাজের যেসব নিয়ম প্রথাকে ইসলামের জন্যে সমর্থন করেছেন এসবই তাঁর সুন্নাহ। এগুলো ছিলো কুরআনেরই বাস্তব রূপ। আয়েশা রা. বলেছেন, কুরআনই ছিলো তাঁর জীবন চরিত।

সুতরাং রসূলুল্লাহ সা. এর আদর্শ বলতে বুঝায় কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সমস্ত বিধি বিধান ও জীবন যাপনের যাবতীয় পথনির্দেশ। এগুলোর সমন্বিত রূপই রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ।

৩. রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ নিজেই নিজের জীবন-বিধান ও জীবন যাপনের সঠিক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে না। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত, দৃষ্টি অপ্রশস্ত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে সে অজ্ঞ। ফলে মানুষ কিছুতেই তার জীবন বিধান ও জীবন যাপনের স্থায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারে না।

মানুষের জীবন যাপনের সঠিক ব্যবস্থা তো তিনিই দিতে পারেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি জানেন, কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ। যিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সমভাবে জ্ঞান রাখেন, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য -মিথ্যা ও লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে যিনি সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন।

এমন সত্তা তো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। হ্যাঁ কেবল মহান আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি মানুষকে তার সঠিক চলার পথ বলে দিতে পারেন, যিনি মানুষকে অকল্যাণ থেকে বাঁচার পথ এবং সত্যিকার কল্যাণের পথ বাতলে দিতে পারেন।

মহান আল্লাহই তো সেই সত্তা সকল মানুষ যার একার সৃষ্টি, সকল মানুষ যার জন্মগত দাস, সকল মানুষের যিনি সমভাবে কল্যাণ চান, আপন সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষকে যিনি সমানভাবে ভালোবাসেন। তাই জীবন বিধান ও জীবন ব্যবস্থার জন্যে মানুষ কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী।

তিনি পরম দয়ালু। তিনি তাঁর সৃষ্টি মানুষকে একান্তভাবে ভালোবাসেন। তাইতো মানুষের জীবন যাপনের পথ তিনি বাতলে দিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন সিরাতুল মুস্তাকীম। এজন্য তিনি রসূল নিয়োগ করেছেন। কিতাব নাযিল করেছেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ হিদায়াত নাযিল করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

মুহাম্মদ সা. আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী নিজেকে গড়েছেন, সমাজ নির্মাণ করেছেন, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, পরিচালনা করেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন ছিলো আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত ও জীবন ব্যবস্থার মূর্ত প্রতিক। মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় অকল্যাণ থেকে মুক্তি পেতে হলে, আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়া থেকে বাঁচতে হলে এবং তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের মডেল :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ •

"রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ। (সূরা ৩৩ : ২১)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ •

"হে নবী ওদের বলে দাও! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" (সূরা ৩ : ৩১)

সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এটা শুধু তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার কারণেই নয়, বরং আমাদের ইহ জাগতিক এবং পারলৌকিক মুক্তির এটাই একমাত্র পথ।

৪. রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়ন বলতে কী বুঝায়?

রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হবার পর এখন আমাদের দেখতে হবে, রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা বলতে আসলে কী বুঝায়?

রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়ন বলতে বুঝায় মূলত রসূলুল্লাহ সা. ইসলামকে যেভাবে পেশ করেছেন, ইসলামের ভিত্তিতে যেভাবে জীবন যাপন করতে শিখিয়েছেন, ইসলামের ভিত্তিতে যেভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে ও পরিচালনা

করতে শিখিয়েছেন, যেভাবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে শিখিয়েছেন, আমাদের পুর্ণাংগ জীবন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ঠিক সেভাবে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করাটাই হলো রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা। আর এসব ক্ষেত্রে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায় :

১. আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনের পুর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।
২. রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।
৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ।
৪. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল রন্ধ্র থেকে সর্বপ্রকার জাহেলিয়াত তথা কুফরি, শিরক, বিদয়াত, ফিসক, ফুজুর ও ফাহেশাত ইত্যাদি উচ্ছেদ।
৫. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে একচ্ছত্রভাবে আল্লাহর আইন ও কর্তৃত্ব তথা আল্লাহর দীনের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা।
৬. কুরআন সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা চালু করা।
৭. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল প্রচার মাধ্যমকে প্রধানত ইসলামের প্রচার ও জনগণের প্রশিক্ষণ এবং কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখা।

৫. বাংলাদেশে রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়নে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

একথা তিক্ত হলেও সত্য যে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়িত নেই। এদেশের মানুষ রসূলুল্লাহ সা.-এর নামে ব্যাকুল। কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদাসীন ও গাফিল। এদেশের মানুষ কোনো বিধর্মী কর্তৃক রসূলুল্লাহর অবমাননা বরদাশত করতে এক মুহূর্তের জন্যেও প্রস্তুত নয়। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তাঁর আদর্শের অনুসৃতি নেই সেদিকে আমরা জাতি হিসেবে ভ্রুক্ষেপও করছি না।

ফলে বাংলাদেশে যারাই রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসেন, তারা কতিপয় সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। আমরা এখানে সংক্ষেপে কতিপয় সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করছি :

১. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা : অজ্ঞতা শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, শুধু আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যেই নয়, স্বয়ং মাদ্রাসায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইসলাম সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপক অজ্ঞতা। কারণ

মাদ্রাসা শিক্ষাও পুরোপুরি ইসলামি শিক্ষা নয়। একদল আলেমের ইসলাম সম্পর্কে সেক্যুলার দৃষ্টিভংগিও রয়েছে।

২. ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস : কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এদেশের মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে শিরক, বিদয়াতসহ ব্যাপক অনৈসলামি ধ্যান-ধারণা ইসলামের নামেই প্রবেশ করে আছে।
৩. শিরক ও বিদয়াতপন্থী ধর্মীয় কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রভাব এবং তাদের পক্ষে সরকার ও ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা।
৪. অনৈসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামি শিক্ষা সংকোচন।
৫. ব্রাহ্মণ্যবাদী, নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী সংস্কৃতির প্রভাব।
৬. অনৈসলামি সমাজ ব্যবস্থা।
৭. অনৈসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা।
৮. অনৈসলামি সরকার। সরকারের ইসলাম বৈরিতা।
৯. বিভিন্ন ধ্যান ধারণাপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে কোন্দল।
১০. আলেমদের অনৈক্য।
১১. ইসলামি দলসমূহের ঐক্যের অভাব।
১২. আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রভাব।
১৩. বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও গোষ্ঠীর খণ্ডিত ইসলাম প্রচার।
১৪. প্রচার মাধ্যমসমূহের বৈরিতা এবং প্রচার মাধ্যমসমূহে ইসলামি আদর্শ প্রচারের অবাধ সুযোগ না থাকা।
১৫. ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয় অপপ্রচার।
১৬. ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও দলের বিরুদ্ধে অপ্রপপ্রচার।
১৭. ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ইসলামপন্থীদের উপর নির্যাতন।
১৮. সরকার ও প্রভাবশালী শ্রেণীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
১৯. মেয়েদেরকে ইসলামি শিক্ষা প্রদানের অপ্রতুল ব্যবস্থা।
২০. অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কার, গোড়ামি, অন্ধ অনুকরণ।
২১. অপসংস্কৃতির আগ্রাসন।

৬. বাংলাদেশে রসূলুল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা

এতোসব সমস্যা, বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের মতে বাংলাদেশে রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনাময় দিক। আমরা এখানে সংক্ষেপে কতিপয় দিক উল্লেখ করছি :

১. ইসলামের গভীর বদ্ধমূল শিকড় : আলহামদুলিল্লাহ। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের অন্তরে ইসলামের শিকড় এতোটা গভীর ও বদ্ধমূল যে, তা নিশ্চিহ্ন করবার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহ, কুরআন, রসূলুল্লাহ সা., রসূলের সুন্নাহ এগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলে এবং এগুলোর প্রকাশ্য অবমাননা করে এদেশে কারো পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়। এর প্রমাণ এদেশের মুসলমানরা বারবারই দিয়েছে। এমনকি ইসলামের কথা না বলে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে এদেশে কারো পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়াও কঠিন।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা : মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামি না হলেও এ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত লোকেরা ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তাদের অধিকাংশই রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ সমুন্নত রাখেন এবং তাঁর শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরাই এদেশে ইসলামকে জিইয়ে রেখেছেন এবং ইসলামের বাতি জ্বেলে রেখেছেন।

৩. ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : এদেশের বিরাট সংখ্যক লোক এখন রসূলুল্লাহর পূর্ণাংগ আদর্শ এখানকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখন আর নগণ্য নয়। সকল সমস্যা, বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মুখেও তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এ আন্দোলন ছাত্র/ছাত্রীসহ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৪. কুরআন শিক্ষা ও প্রচারের প্রতি আগ্রহ : আলহামদুলিল্লাহ! সম্প্রতি বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কুরআনের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কুরআনভিত্তিক আলোচনা সভা, কুরআন ক্লাস, সাধারণ মানুষের মধ্যে তাফসির মাহফিল এবং কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে শিখার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. দা'য়ী ও প্রচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি : খাঁটি ইসলাম প্রচারকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ওয়াজ মাহফিল, তাবলীগী কাজ, ব্যক্তিগত দাওয়াত, ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা সভা ইত্যাদি এখন অগ্রসরমান।

৬. তফসির ও ইসলামি সাহিত্য রচনা : ইতোমধ্যেই বাংলাভাষায় অনেকগুলো তফসির প্রকাশ হয়েছে। প্রচুর ইসলামি সাহিত্যও প্রকাশিত হয়েছে এবং এগুলোর বিরাট বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

৭. প্রাতিষ্ঠানিক কাজ : সারাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারমূলক প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও পাঠাগার গড়ে উঠছে।

৮. ইসলামি এনজিও : অনেকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামি N.G.O এখানে গড়ে উঠেছে।

এছাড়া এখানে আরো এমন সব Factors আছে এবং কাজ করে যাচ্ছে, যেগুলোর ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে আল্লাহর রসূলের আদর্শ বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা প্রচুর।

৭. রসূলুল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই বলিষ্ঠ অংগীকার

ইসলাম প্রিয়দের যেসব বিষয়ে অঙ্গীকার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা কতিপয় প্রস্তাব, পরামর্শ ও সুপারিশ নিম্নে পেশ করছি :

১. ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলন জোরদার করার অংগীকার।
২. ব্যাপকভাবে কুরআন ক্লাস, তফসির মাহফিল ও হাদিসের মাহফিল চালু করার অংগীকার।
৩. ১০০% শিশুকে ইসলামি শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। মায়েদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
৪. ইসলামি লেখক লেখিকাদের ব্যাপকভাবে ইসলামি সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করা। ইসলামি লেখক তৈরি করা। এ জন্যে পদক্ষেপ নেয়া।
৫. ব্যাপকভাবে ইসলামি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা।
৬. ওয়ায়েয সৃষ্টি করা এবং ব্যাপকভাবে ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা।
৭. মসজিদগুলোকে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত করা।
৮. ব্যাপকভাবে মাদ্রাসা গড়ে তোলা এবং ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় দেয়ার জন্যে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা। মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা।
৯. ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গণমাধ্যম সৃষ্টি করা।
১০. পাড়ায় পাড়ায় ইসলামি পাঠাগার গড়ে তোলা।
১১. ব্যাপকভাবে ইসলামি গ্রন্থ মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
১২. ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করা এবং আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের রসূলুল্লাহর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া।
১৩. শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলা।
১৪. ইসলামের কল্যাণ ও বাস্তবতার প্রতি ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

১৫. ব্যাপকভাবে মহিলাদের মাঝে দাওয়াত সম্প্রসারণ, ইসলামি শিক্ষার প্রসার, ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করা এবং ইসলাম প্রচারের কাজে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা।

১৬. অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যমান বিভ্রান্তিসমূহ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। ইসলামি রাষ্ট্র যে অমুসলমানদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর, তা তাদের বুঝিয়ে দেয়া। তাদের মধ্যে ব্যাপক দাওয়াতি কাজ করা। ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৭. যুব সমাজের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ। ব্যাপক সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলা করা।

১৮. ইসলামের আদর্শ এবং ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে ব্যাপকহারে অডিও ভিডিও প্রোগ্রাম তৈরি ও প্রচার করা। রেডিও টিভিতে প্রোগ্রাম করা।

১৯. বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, যেমন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ক্রীড়াবিদ ও সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ। তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

২০. ইসলামি ব্যক্তিত্ব, সংস্থা, সংগঠন ও তৎপরতাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

পরিশেষে বলতে চাই, এদেশে রসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়নে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা প্রচুর। কিন্তু এক্ষেত্রে সম্ভাবনা আরো প্রচুর। প্রয়োজন শুধু সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্যে একদল শিক্ষিত, কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান যুবক যুবতীর এগিয়ে আসা। প্রয়োজন ইসলামি যুবশক্তির আপোসহীন অংগীকার। প্রয়োজন দৃপ্ত শপথের। প্রয়োজন প্রিয় রসূলকে ভালোবাসার। প্রয়োজন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবনবাজি রাখার।

হে দীপ্তপ্রাণ যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর রসূলের ভালোবাসার পথে সব বাধা ডিঙিয়ে এগিয়ে যাবার কেউ আছে কি?

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا •

"যারা আমার পথে এগিয়ে যাবার সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যি তাদেরকে আমার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবো।" (সূরা ২৯ আনকাবূত : আয়াত ৬৯)

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

০১. আল কুরআন
০২. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাছির : তফসিরে ইবনে কাছির
০৩. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন
০৪. সহীহ আল বুখারি
০৫. সহীহ মুসলিম
০৬. আবু ঈসা তিরমিযি : শামায়িলুন নবী
০৭. মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক : সীরাতু রাসূলিল্লাহ
০৮. আবদুল মালেক ইবনে হিশাম : সীরাতুন নবুবীয়্যা
০৯. ইবনুল কায়্যিম : যাদুল মা'আদ
১০. সুলাইমান মনসুরপুরি : রহমাতুললিল আলামীন
১১. মুহাম্মদ ইবনু আবদুল ওহ্হাব : মুখতাসার সিরাতুর রসূল
১২. আবদুর রউফ দানাপুরি : আসাহ্হুস সিয়ার
১৩. শিবলী নুমানী : সীরাতুন্নবী
১৪. আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সরওয়ারে আলম
১৫. মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল : হায়াতু মুহাম্মদ
১৬. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ : রসূলে আকরাম কী সিয়াসি যিন্দেগি
১৭. নঈম সিদ্দিকী : মুহ্সিনে ইনসানিয়াত
১৮. আবদুর রহমান আযযাম : আর রিসালাতুল খালিদাহ্
১৯. তাওফিক আল হাকিম : মুহাম্মদ
২০. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ : আহদে নববী কে নেযামে হুকুমরানি
২১. সৈয়দ আমির আলী : দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম
২২. মুহাম্মদ সায়ীদ : তাওয়ারিখে মুহাম্মদী
২৩. আবদুর রহমান আবু বকর সুয়ূতি : তারিখুল খোলাফা
২৪. সাইয়েদ আমীমুল ইহসান : তারিখুল ইসলাম
২৫. মুহাম্মদ আয যাহাবি : তারিখুল ইসলাম
২৬. মুফতি মুহাম্মদ শফি : সিরাতু খাতামুল আম্বিয়া
২৭. মুহাম্মদ ইদরিস কান্দুলুভি : সীরাতুল মুস্তফা
২৮. মুহাম্মদ ইবনু আছির : আল কামিল ফিত তারিখ
২৯. মুহাম্মদ আলী : মুহাম্মদ দ্যা প্রফেট

আবদুস শহীদ নাসিম
লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন?
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি : কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ্
শাফায়াত
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
নির্বাচনে জেতার উপায়

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম ও ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ্
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহ্‌র বিচার ব্যবস্থা
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড (এবং অন্যান্য খণ্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি
দাওয়াত ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

এছাড়াও আরো অনেক বই

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬